বিদ্যুৎ-শিখা

শ্রীমতিলাল দাশ এম্, এ. বি-এল্
প্রণীত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

মূল্য ১৲ টাকা

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ—

সোদরোপম বন্ধু

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়

করকমলেষু।

প্রীতিময়েষু,

এ সংসারে প্রীতি দুর্লভ, আপনি সেই প্রীতি অজস্র দিয়াছেন, তাহারই স্মৃতির জন্য 'বিদ্যুৎ-শিখা' আপনার হাতেই দিলাম। আমাদের ঘন তমসা বিদ্যুৎ-শিখায় যেমন ক্ষণিক চকিত হয়, তেমনই যদি আপনার কর্ম্মব্যস্ত জীবন 'বিদ্যুৎ-শিখার' হাসি ও কৌতুকের আলোকে ক্ষণিক আনন্দোজ্জ্বল হয়, শ্রম সার্থক মনে করিব।

১লা ভাদ্র
১৩৩৯

প্রীতিকামী
শ্রীমতিলাল দাশ।

সূচীপত্র

বিদ্যুৎ-শিখা

প্রেমের মূল্য

১

বাদল মেঘের ধূপ-ছায়ায় গোধূলি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। প্রসাধন শেষ করিয়া নীলিমা নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরিয়া স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্বামী জিতেশ উপনিষদের পাতার মধ্যে ডুবিয়া বিশ্বজগৎ ভুলিতে বসিয়াছিলেন। পত্নীর জুতার মস্‌মস্‌-শব্দে চকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—"বা, কি অপরূপ সজ্জাই হয়েছে! চণ্ডীদাসের সুরে সুর মিলায়ে বলতে ইচ্ছে হয়,—

"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

নীলিমা পুলকিত হইয়া উত্তর দিল, "যাও, দুষ্টুমী করো না, আমি বেড়াতে চল্লম। ললিতা'দির বাড়ীতে নারী-সমিতির অধিবেশন, ফিরতে রাত হবে। ৯টা বাজলে ভজুয়াকে লণ্ঠন নিয়ে পাঠিয়ে দিও।"

জিতেশ কৌতুক-ভরাকণ্ঠে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল, এমন ভুবনমোহন বেশে কারও মনোহরণ করতে চলেছ ব'লে ভয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া যাবে। নারী-সমিতি এবার কি আলোচনা করছেন, দেবি? পুরুষদের হাত হ'তে রাজ্যভার কেড়ে নেওয়ার জন্য যুদ্ধ-ঘোষণা হবে কি?"

নীলিমা কুপিত কণ্ঠে বলিল, "যাও, অনধিকারচর্চ্চা করো না। তোমাদের বিষ্ণুশর্ম্মা অব্যাপারে ব্যাপার করলে কি নিগ্রহ হয় বলেছেন, তা জান ত?"

জিতেশের হাস্য-বিভাত গণ্ডদেশে রক্তিমাভার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনায়িত হইয়া উঠিল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "আচ্ছা, অপরাধ মার্জ্জনা কর। রাত ৯টার সময় যদি ভুলে না যাই, ভজুয়াকে পাঠিয়ে দেবো'খন।"

"বেশ স্বার্থপরের মত উত্তরটা হয়েছে। তুমি এ দিকে ভাবে মসগুল হয়ে থাক, আর আমি ও-দিকে আটকে প'ড়ে থাকি। যাও, একটু বেড়িয়ে এস, তার পরে ঘড়ীর দিকে নজর রেখো। আর তোমার ঐ সব বাজে বই না প'ড়ে, দু'চারখানা আইন-বইয়ের পাতা উল্‌টিও, তা হ'লে ভুলবে না।"

জিতেশ বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

নীলিমা সুগন্ধি সুবাস ছড়াইয়া বেড়াইতে চলিল। জিতেশ কঠোপনিদের

পাতা খুলিয়া, মৃত্যু-সাগর-তিতীষু সাধক কেমন করিয়া ইহলোকেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার সন্ধানেই নিযুক্ত হইল।

স্বামী ও স্ত্রী আর কয়েকটি পরিচারক-পরিচারিকা লইয়া সংসার। স্বামী ওকালতী করেন। কিন্তু ওকালতীর নথির পরিবর্ত্তে পুথির স্পর্শ তাঁহার প্রিয়তর। পিতৃ-ত্যক্ত কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া পারমার্থিক রসে ডুবিয়া আছেন। পত্নী নীলিমা সুরূপা ও সুশিক্ষিতা। তরুণ ও তরুণী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্ধন সুনিবিড় হইয়াছিল কি?

সখী সুলেখার কাছে একখানি পত্রে নীলিমা নিজেদের দাম্পত্য-সম্বন্ধের একটি ছবি আঁকিয়াছিল। তাহাতে সে লিখিয়াছিল, তাহার স্বামী বহু গুণে গুণী, কিন্তু তবুও এখনও পর্যন্ত নীলিমা তাঁহার নাগাল পায় নাই। তিনি যেন ভাদ্রের ভরা নদী, কূলপ্লাবী জলে শান্ত সমাহিত হইয়া আছেন, চঞ্চলতার ঢেউ তাঁহার বক্ষকে আন্দোলিত করে না। তাঁহার প্রেমের গভীরতার সম্বন্ধে সে সন্দিহান নহে, কিন্তু তিনি সে শ্রেণীর রসিক নন—যাহার জন্য বিদ্যাপতির রাধার মত সে বলিতে পারে—"কৈছে গোঙাব হরি বিনে দিন রাতিয়া।" তাহার মনে বিলাসিতা ও চপলতা আছে, সে তাহা অস্বীকার করে না। স্বামী উহা পছন্দ করেন না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস, কিন্তু নিজের প্রেমের জোরে তিনি তাহার লঘুতাকে দূর করিবেন, এ জোরও তাঁহার নাই। তিনি সত্যাগ্রহীর মত নীরবে সহিয়া জিতিতে চান। এ নীরবতাকে সে সহ্য করিতে পারে না। সে চাহে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ—যাহার অবসানে উভয়ের মধ্যে উভয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার উচ্ছ্বাস নাই, তর্ক নাই, প্রশান্ত সাগরের মত প্রশান্ত হৃদয় লইয়া তিনি দূরে মহত্ত্বের শিখরে বসিয়া, যেখানে সে পৌঁছিতে পারে না। আর

সে যেখানে, সেখানেও তিনি নামিয়া আসেন না। তাহার অন্তরে আধুনিকতার স্পর্শ এমন প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছে যে, দাসীপণা করাকে সে সতীত্বের ও প্রেমের কষ্টিপাথর বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। তাহার স্বতন্ত্রতাকে, ব্যক্তিত্বকে সে প্রকাশ করিতে চাহে। তাহার স্বামীর জীবন একেবারে নিয়ম-গড়া, কোথাও ছন্দের গতি-ভঙ্গ হইবার উপায় নাই; তাঁহার জীবনে মানুষের বন্ধুত্ব প্রবল হইতে পারে নাই। তাই তিনি পুস্তকের রাশিকে প্রিয়সখা করিয়া তুলিয়াছেন। সে কিন্তু এই ধরিত্রীর মানুষের কলকোলাহলকে বেশী ভালবাসে। স্বামীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাহার আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রেম এক নহে।

তাহাদের পাশের বাড়ীতে এক মুন্সেফ থাকেন। তাঁহার পত্নীপ্রীতি সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিতভাবে লিখিয়াছে—ছেলেমানুষের মত এই দম্পতি মান অভিমানের হাজার লীলা অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন, দেখিলে হিংসা হয়। কখনও সন্ধ্যায় উভয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া পাশের মেরু-পাহাড়ে বেড়াইতে যান, কখনও জ্যোৎস্না-রাত্রিতে তাঁহাদের বাংলোর ইউক্যালিপ্টাস গাছের ছায়ায় স্বামী বাঁশী বাজাইয়া থাকেন, স্ত্রী জানুতে মাথা দিয়া শ্রবণ করেন। কখনও স্ত্রী পিয়ানো বাজান, আর স্বামী সব কায ভুলিয়া পত্নীর চারুমুখের কম্পন-রেখার পানে আত্মবিহ্বল হইয়া চাহিয়া থাকেন। পত্নীব্রত ও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহার দুর্নাম আছে, কিন্তু নীলিমার এই দম্পতিকে খুব ভাল লাগে।

পত্রের শেষভাগে সে লিখিয়াছিল, প্রেমকে সে তুচ্ছ করিয়া তুলিতে প্রস্তুত নহে। যে অবজ্ঞাভরে উহা চাহে, তাহার চরণে সে সব ঢালিয়া দিতে পারিবে না। তাহার প্রেমকে জয় করিয়া লইতে হইবে। বীর্যাকে সে প্রণতি জানায়, কাপুরুষতাকে তুচ্ছ মনে করে। তবে সে সম্পূর্ণ আশা

ছাড়ে নাই। এক শুভ মুহূর্ত্তের বাতাসে হয় ত দুর্দ্দিনের মেঘ অন্তর্হিত হইবে। যে স্বাতন্ত্র্য তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, সমন্বয়ের মধুরতায় তাহা পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

২

বিতত তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া গৈরিক-রাঙ্গা পথ। পশ্চিম-বাঙ্গালার কঙ্কর মৃত্তিকায় গুল্ম ও আগাছা জন্মাইয়া কুঞ্জটিকে বিরূপ করিয়া তুলে নাই। বাগানের অপর পাশেই ললিতা-দিদির বাড়ী। তিনি পেন্সনভোগী শিক্ষয়িত্রী—সহরের সকল নারীরই দিদি। ললিতা-দিদি চিরকুমারী এবং নারী-সমিতির সম্পাদিকা। তাঁহার নিরুপদ্রব গৃহে প্রতিদিনই মেয়েদের মজলিস বসে, আর মাসে একবার করিয়া নারী-সমিতির অধিবেশন হয়। নারী-সমিতির চর্চ্চার ফল কিছু হইয়াছে কি না, তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু কর্ম্মীদের উৎসাহ ও আড়ম্বরের অবধি ছিল না। পুরবধূগণের নিত্য নূতন সাজ, ফ্যাসনের বিবর্ত্তন আর যানাদির ব্যয়ে পুরবাসিগণ যে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না।

নীলিমা বয়সে তরুণী হইলেও, প্রায় একাকীই বাগানের পথ দিয়া ললিতা-দিদির বাড়ীতে যাইত। সে নির্জ্জন পথে কাহারও সহিত কখনও দেখা হইত না বলিয়া সে নিঃশঙ্ক চিত্তে গমনাগমন করিত।

দেরী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া নীলিমা জোরে চলিতেছিল। হঠাৎ বাঁশীর সুর শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল। শব্দ-ত্রস্ত হরিণীর ন্যায় সে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঁশীর সুর-ঝঙ্কার লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একটি যুবক আম্রবৃক্ষের ছায়ায় তৃণাসনে বসিয়া আপনমনে বাঁশী বাজাইতেছে। যুবকের মস্তকে একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, গায় ঢিলা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। রূপবান্ বলা চলে না, তবে যৌবনোচিত একটি কান্তির অভাব নাই।

আজকালকার তরুণ-দলের কাহারও কাহারও মধ্যে যে মেয়েলী ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই মেয়েলী-পনার কোমলতায় যুবকটিকে তরুণী বলিয়া ভ্রম করিলে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না।

যুবকটি তরুণীর শাড়ীর খস্‌খস্ ও পায়ে চলার শব্দে নীলিমার উপস্থিতি অনুভব করিল। বাঁশী থামাইয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে অপূর্ব্ব সুন্দরী! সজ্জায় ও প্রসাধনে চিত্তহরা অপ্সরার মত সহসা যেন সে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইয়াছে। চলার ক্লান্তিজাত স্বেদজাল মুক্তাবিন্দুর মত তাহার কপোলের সিন্দূরবিন্দুকে ঘিরিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রচনা করিয়াছিল।

পলকের জন্য দৃষ্টি-বিনিময় হইল। তাহার পর নীলিমা দ্রুতপদেই চলিয়া গেল, আর অপরিচিত যুবা বাঁশী তুলিয়া লইল। নীলিমা নব্য নারীর মতে চলিয়া পুরুষের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে কুণ্ঠিত নহে; কিন্তু পরিচয়ের পর সামাজিক নিয়ম-কানুনের মাঝে আলাপ ও সঙ্গ এক, আর নির্জ্জন পথে দেখা স্বতন্ত্র কথা, কাযেই নীলিমা অপ্রতিভ ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া সহজাত সংস্কার দুরতিক্রমণীয়। বক্তৃতাকালে আস্ফালন আর কার্য্যকালে তাহার প্রয়োগ, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ নাই কি?

নীলিমার পুথি-পড়া সমস্ত সাহস পরাভূত হইয়া লজ্জার শরণ লইল।

অপ্রস্তুতভাবে অন্যমনে চলিতে চলিতে সহসা তাহার মাথার সোনার ফুল, তরু-শাখায় বাধিয়া পড়িয়া গেল। নীলিমা তাহা অনুভব করিতে পারিল না।

যুবা ভদ্রতার অনুরোধে বাঁশীতে সুর দিতেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে নীলিমার গমন-সুন্দর মূর্ত্তির দিকে লুকোচুরি করিয়া চাহিতেছিল। তাহার মনে কি হইতেছিল, কে জানে, তবে দৃষ্টির আকুলতা দেখিলে মনে হয়, সে যেন মনে মনে বলিতেছিল,—

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

যুবকটি দেখিল, নীলিমার মাথার ফুল মাটীতে পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ফুলটি কুড়াইয়া গাছের ফাঁক দিয়া চলিয়া নীলিমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নীলিমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবক সম্ভ্রম-নত মৃদু-ভাবে বলিল, "আমায় মাপ করবেন, আপনার মাথার ফুলটি প'ড়ে গিয়েছিল, এই নিন।"

নীলিমা কম্পিত-হস্ত বাড়াইয়া ফুল লইল, তার পর মনের জোর সংগ্রহ করিয়া বলিল, "আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন। এটি আমার স্বামীর প্রথম উপহার অর্থে ইহার মূল্যের নিশ্চয়তা করা চলে না। আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো।"

যুবকটি কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না, এর জন্য আপনি কুণ্ঠিত

হবেন না, কৃতজ্ঞতার কোনই প্রয়োজন নেই, আপনি বরং আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করবেন, আপনার সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করা হয় ত আপনার অপ্রীতিকর হয়ে উঠছে—আমায় ক্ষমা করবেন।"

নীলিমা উত্তর দিল, "না, না, আপনার কোন অন্যায়ই হয় নি। আচ্ছা, এখন আসি। নমস্কার।"

পল্লবদল-কোমল সুগৌর হাত দুইটি তুলিয়া নীলিমা নমস্কার জানাইল। যুবক হয় ত আলাপের সেখানেই সমাপ্তির আশা করে নাই। তাই কি বলিবে, হঠাৎ যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পথ ছাড়িয়া দিয়া সে-ও বলিল, "নমস্কার!"

নীলিমা বিভ্রান্ত-মনে ললিতা-দিদির বাড়ীতে চলিল; সারাপথ সে আপনার আনাড়ী-পনার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিল। বহু-বার কল্পনায় সে বিপদে পড়িলে কেমন দুঃসাহসিকতার কায করিয়া নারী-জাতির মুখোজ্জ্বল করিবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কল্পনা যে কেমন করিয়া রূঢ় প্রতিঘাত পাইতে পারে, আজিকার সামান্য ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারিয়া, নীলিমার স্বস্তি ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়া নিজের অকৌশল ও অপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা বুঝিতে পারিয়া গ্লানিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

অকারণে সে যুবকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নির্জ্জন কুঞ্জে বসিয়া বাঁশী বাজাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল?

এ দুশ্চিন্তা আর অগ্রসর হইতে না হইতে নীলিমা ললিতাদিদির বাড়ী পৌঁছিল।

৩

বারান্দায় পা দিতেই ভিতরের হল-ঘর হইতে সুস্বর-লহরী ভাসিয়া আসিল। পল্লীসহরের সেরা গায়িকা মেখলা গাহিতেছিল। কণ্ঠও যেমন মধুর, কলাশিক্ষার নিপুণতাও তেমনই সমধিক। সুরের কম্পনে সমস্ত গৃহ, ভবন যেন পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। মেখলা গাহিতেছিল,—

"দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি,
দিন আগত ঐ,
ভারত-'নারী' কই!
সে কি রহিল আজি সুপ্ত সব জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্ব-কর্ম্ম-ভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান্ হে!"

নীলিমা চাহিয়া দেখিল, বেলাশেষের মেঘে আকাশে কি অনবদ্য সজ্জা-সম্ভার। আত্মগ্লানি ভুলিয়া প্রত্যুদ্গমনকারিণী গৃহকর্ত্রীকে সম্বোধন করিল, "ললিতা-দি! আমার কি দেরী হয়ে গেছে?"

ললিতা-দিদি যেমন বিপুল কলেবরা, তেমনই গম্ভীরা। তিনি উত্তর দিলেন, "না, সবাই এখনও পৌঁছে নি।"

ঘরে প্রজাপতির মেলা বসিয়াছিল বলিলেই হয়; বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী কিশোরী ও বালিকারা দল পাকাইয়া মজলিস্ করিয়া বসিয়াছিল।

তাহাদের কত বিচিত্র সাজ, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে "বাঁশবনে ডোম-কাণা" হইতে হইবে।

নীলিমাকে দেখিয়া বসু-জায়া চশমা খুলিয়া স্মিত-হাস্যে বলিলেন, "দেখ বোন্, আমার বক্তব্য তোকে সমর্থন করতে হবে।"

তরুণী একটি বধূ পাশে বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কি প্রস্তাব উপস্থিত করছেন, দিদি ?"

বসু-গিন্নী বলিলেন, "হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলন হওয়া উচিত।"

রেখা বেথুনে বি, এ, পড়ে, ছুটীতে আসিয়াছে; সে কৌতুকোচ্ছল স্বরে চুপে চুপে পার্শ্বস্থ বৌদিদিকে বলিল, "বিচ্ছেদ না হোক, বিবাহ-ব্যবচ্ছেদ এবার থেকে সুরু হবে বোধ হয়।"

বোধ হয় সে এখনও তেমন নব্যা হইতে পারে নাই।

নীলিমা মনে মনে এ প্রস্তাব সমর্থন করিবার সাড়া পাইল না; কারণ, নিজের স্বামীর কাছে বহুবার একনিষ্ঠ প্রেমের মহত্বের কথা শুনিয়া চলিত বিবাহ-প্রথাকে মঙ্গলময় বলিয়া সে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাহা ছাড়া পিতা-মাতার আদর্শকে সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি উপরোধ এড়াইলে সকলে তাহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিবে, এই দুর্ব্বলতার মোহ এড়াইতে না পারিয়া সে সায় দিল।

সভানেত্রীর বক্তৃতায় পুরুষ-জাতির অনাচার ও উৎপীড়নের কথা এরূপ জ্বলন্তভাবে আলোচিত হইল যে, অনভিজ্ঞ লোক হয় ত মনে করিতে পারিত যে, নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব যেন নিত্যদিন সর্ব্বত্রই চলিতেছে। বক্তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বেশী নহে; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি

চিরকুমারী। তবে তিনি পরের মতের বৃহৎ বোঝাটিকে অবলীলাক্রমে স্কন্ধে লইয়া চলিয়াছেন।

তাহার পর নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে নানা প্রস্তাব পেশ ও মঞ্জুর হইল এবং কৌতুকাবহ বহু বক্তৃতায় তাহা উত্থাপিত ও সমর্থিত হইল।

অবশেষে বসু-গিন্নী উঠিয়া বলিলেন, "বান্ধবীগণ! আমি আপনাদের মুক্তির বার্ত্তা, স্বাধীনতার বাণী শোনাতে চাই। হিন্দু-নারী যুগ-সঞ্চিত আবর্জ্জনায় চাপা পড়েছে—তার উদ্ধারের মন্ত্র ও অস্ত্র আপনাদের হাতে। আপনারা উঠুন ও জাগুন! ভারতবর্ষের বিবাহ প্রেমহীন বিবাহ। সে বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার চাই। যে বিবাহ প্রেমের পাঞ্চজন্য-শঙ্খে সম্বর্দ্ধিত হয় নি, তার কি মূল্য? অতএব আমি বলতে চাই, স্বামী ও স্ত্রী যেখানে প্রেমে যুক্ত হন নি, সেখানে বিবাহ হয় নি। অতএব হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার প্রবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

সভায় গোপন হাসি ও চোরা চাহনি এক দিকে চলিতেছিল, অন্য দিকে কতিপয় কুমারী ও তরুণী বধূ বসুজায়ার বক্তৃতার জয়গান করিবার জন্য করতালি প্রদান করিলেন।

নীলিমার মনে হইতেছিল, সে একবার বলে, সে এ প্রস্তাব সমর্থন করে না; কিন্তু ভারগ্রহণ করিয়া অসম্মত হওয়া তাহার কাছে অভদ্র ও অশোভন বলিয়া মনে হইল।

সে বলিতে লাগিল, "ভারতবর্ষে যে প্রেম নাই, বক্তার এ কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত—তাহার বাহ্য-চ্ছটা নাই, কিন্তু গভীরতা আছে। অবশ্য একনিষ্ঠ প্রেমই বিবাহের লক্ষ্য;

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যেখানে নিত্য বিরোধ ও কলহ, সেখানে বিচ্ছেদ হওয়া আমি অন্যায় মনে করি না।"

নীলিমার বলিবার ধরণ ও তাহার সুগভীর আত্ম-বিশ্বাস সকলকে মুগ্ধ করিল। সভায় তাহার সংশোধিত প্রস্তাবমত বিবাহ-বিচ্ছেদ মন্তব্য গৃহীত হইল। তাহার পর জলযোগ ও যথেষ্ট পরচর্চ্চার শেষে মোটরে, ঘোড়ার গাড়ীতে ও পদব্রজে একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন।

ভজুয়াকে অনুপস্থিত দেখিয়া নীলিমা স্বামীর উপর চটিয়া গেল। তাহাদের বাড়ীর এ অমনোযোগ ললিতা-দিদির জানা ছিল। তিনি বলিলেন, "একটু বসো বোন্, আমার চাকরটা কায সেরেই তোমায় দিয়ে আস্‌ছে।"

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া খোসগল্প চলিতে লাগিল। কথায় কথায় নীলিমা বলিল, "দেখ ললিতা-দি, আমাদের বাগানের পথটি তার নির্জ্জনতা হারাতে বসেছে। আজ যখন আসছি, দেখি, একটি ফাজিল ছোকরা ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে—"

"কেমন দেখতে?"

"ছিপ্‌ছিপে গড়ন—লম্বা চোখে চশমা—"

বাধা দিয়া ললিতা-দিদি বলিলেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না, ও আমার বোন্‌পো, অপূর্ব্ব। অপূর্ব্বের নাম শুনিস্ নি? আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল হয়ে পড়েছে। ওর বে-পরোয়া লেখার প্রশংসা সবাই করছে—ভয় নেই, ও যেন মুক্ত পাখী—প্রাণের অজস্র ও অবাধ প্রাচুর্য্যে ও লিখে চলেছে।"

নীলিমা বলিল, "হাঁ, নাম শুনেছি বটে, কিন্তু উনি এ সব নব্য-সাহিত্য

পছন্দ করেন না, কাযেই অপূর্ব্ব বাবুর লেখা একখানি দু'খানি চেয়ে চিন্তে পড়েছি—"

ললিতা-দিদি বলিলেন, "ও এখানে ওর গল্পের মসলা খুঁজতে এসেছে। আমায় বলছিল যে, এমন একটা বই এবার লিখবে—যা এ দেশে যুগ-পরিবর্ত্তন ক'রে দেবো।"

"কোথায় উঠেছেন উনি ?"

"ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছে, আমার এখানে প্রায়ই আসে। ওকে বলেছি যে, আমাদের সমিতিতে একটা প্রবন্ধ পড়তে হবে। রাজী হয়েছে।"

ললিতা-দিদির চাকর লণ্ঠন লইয়া উপস্থিত হইল।

নীলিমা দাড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "সে বেশ হবে, দিদি ! অপূর্ব্ব বাবুর লেখার কদর আছে। তাতে ওঁর বক্তৃতা সবাইকে প্রভাবিত করিবে। আচ্ছা, এখন আসি দিদি, রাত হ'য়ে গেল, নমস্কার !"

৪

বাড়ীতে ফিরিয়া নীলিমা দেখিল, স্বামীর পাঠ-কক্ষ অন্ধকার। প্রতি-দিনের মত সেখানে বাতি জ্বলিতেছে না। অপ্রস্তুতভাবে গৃহে ফিরিবার জন্য, অধ্যয়ন-মগ্ন স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইবার সঙ্কল্প লইয়া সে গৃহে ফিরিয়াছিল।

অন্ধকার গৃহ তাহার মনে আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিল। কথায় বলে, স্নেহ অশুভ-শঙ্কী। প্রিয়পাত্রের বিপদ্‌কেই মানুষ সহসা অনুমান করিয়া

লইয়া থাকে। শঙ্কাকাতর কম্পমান স্বরে সে ভজুয়াকে ডাকিল। বালক ভৃত্য আলোক দেখাইয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল, "মাইজী!"

"বাবুর অসুখ করেছে কি? মাথা টিপছিস না কেন? একটা আলো দেওয়ার বুদ্ধি কি তোদের নাই? অমন গাফিলি করলে তোকে ছাড়িয়ে দেবো বলছি। চল্, বাবুর ঘরে চল্।"

এক নিশ্বাসে সে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। ভৃত্যের পক্ষে ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভবপর ছিল কি না, তাহা বিচার করিবার মত মানসিক অবস্থা নীলিমার ছিল না।

বালক আলো লইয়া পুরোগামিনী গৃহস্বামিনীকে নম্রস্বরে বলিল, "মাইজী, বাবু বাসায় নেই।"

ভৃত্যের কথায় নীলিমা অপ্রতিভ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনা সত্য না হইলেই তাহার পক্ষে শুভ; কিন্তু সে মীমাংসা না করিয়াই প্রতিহত-চিত্তবৃত্তি নীলিমা, স্বামীর উপর অকারণে বিরূপ হইয়া উঠিল। স্বামীর পাঠ-গৃহে পৌঁছিয়া দেখিল, টেবলের উপর বইগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অগোছাল স্বামীর সমস্ত কার্য্যেই বিশৃঙ্খলা। অভিধানে একটি শব্দ বাহির করিবার জন্য হয় ত উহা খুলিয়াছিলেন, সেটা খোলাই রহিয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্য আর কঠোপনিষদ্ মিলাইয়া পড়িতেছিলেন, দুইখানি পুস্তকই খোলা রহিয়াছে, দোয়াতদানীর কলম ও পেন্সিলগুলি ছড়ানো রহিয়াছে।

সমস্ত জিনিষ সুশৃঙ্খল করিতে করিতে সে ভজুয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় গেছেন রে?"

বালক বলিল, "জানি না, মাইজী। এক লম্বা বাবু এসেছিলেন, ওর সাথে চ'লে গেছেন।"

নীলিমা ভাবিয়া পাইল না, স্বামী এত রাত্রি কোথায় কাটাইতেছেন? তাহার স্বামী লোককোলাহল ভালবাসেন না। তিনি পুস্তকের মধ্যে অপরূপ আনন্দ লাভ করেন। কত দিন তর্কপরায়ণ পত্নীকে বলিয়াছেন, "দেখ নীলি! আমায় মানুষের সঙ্গ পীড়া দেয়, কারণ, সেখানে মানুষ তাহার ক্ষুদ্রতা নিয়ে বাস করে, পুস্তকের রাজ্য মানুষের ঐশ্বর্য্যের রাজ্য, সেখানে মানুষ খণ্ডজীবনে ভূমার প্রকাশকে বেঁধে রাখে।"

নীলিমা স্বামীর কথা সমর্থন করে না। মানুষকে সে ভালবাসে। চণ্ডীদাসের মত তারও মনে হয়—

"সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।"

মানুষ তাহার তুচ্ছতা ও নীচতা লইয়াও মানুষ। তাহাকে ঘৃণা করিয়া দূরে বাস করিলে মানুষ-জীবনের সার্থকতা থাকে না।

সেই একান্ত পাঠ-তন্ময় স্বামী কেন ও কোথায় গিয়াছেন ভাবিয়া নীলিমা কূল কিনারা পাইল না। অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

বর্ষারাতের অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় একটা বিচিত্র মাধুর্য্য ছিল। তরু-শ্রেণীর ফাঁকে রাস্তাটি নীলিমাদের বাড়ীর সম্মুখে প্রশস্ত ও খোলা বলিয়া বড় সুন্দর দেখাইত। সহসা বাঁশীর সুর শুনিয়া নীলিমা পথের দিকে চাহিল। বাঁশীতে কি বাজিতেছিল, কে জানে? নীলিমার মনে হইল, যেন ঐ পথিক অপূর্ব্ব। বাঁশী বাজাইবার ভঙ্গীটি উদাস-করা। নীলিমা আপন মনে গড়িয়া তুলিল, যেন বাঁশী বলিতেছে,—

"আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো
সকালবেলার মল্লিকা!
তোমরা আমায় চেনো কি?"

স্বামীর অনুপস্থিতি, বাঁশীর সুর আর সে দিনের সমস্ত উত্তেজনা একত্র মিলিয়া নীলিমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সে ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, "আমি আজ আর ভাত খাব না। বাবু আস্‌লে যত্ন ক'রে খাইয়ে দিবে, আর ভজুয়া যেন লণ্ঠন নিয়ে বাইরে ব'সে থাকে। ঘুমিয়ে পড়লে বকুনি খাবে। বুঝেছ ঠাকুর?"

"হাঁ মা!"

ঠাকুর চলিয়া গেলে নীলিমা শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যাগ্রহণ করিল। নানা দুশ্চিন্তায় তাহার নিদ্রা আসিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু অবশেষে অবসাদ সকলকে পরাজিত করিল। নিদ্রার সুশীতল ক্রোড়ে সে আত্ম-সমর্পণ করিল।

অর্দ্ধরাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিতেই নীলিমা দেখিল, স্বামী পাশে শুইয়া আছেন। আলিঙ্গন-ব্যাকুল তাঁহার সবল হস্ত নীলিমার দেহের উপর এলাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে মেঘ কাটিয়া জোৎস্নায় বিশ্বপ্লাবিত। জানালার ফাঁকে চাহিয়া নিশীথ রাত্রির মৌনমাধুরী সে সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিল।

স্বামী আসিয়া তাহাকে ডাকেন নাই। নিজের মনের কথা স্বামীকে বলিয়া নির্ভয় প্রফুল্লতায় মনকে শান্ত করিতে না পারিয়া নীলিমার হৃদয় অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। স্বামীর কাল্পনিক অনাদরের তালিকা সাজাইয়া সে পুনরায় আত্মাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, নীলিমার আর ঘুম আসে না। বাহিরের প্রকৃতি মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া লীলা করিতেছিলেন, নীলিমার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। অপ্রিয় জল্পনায় তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াই চলিল।

ভোরের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নীলিমা ক্লান্তিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ভাল ঘুম তাহার হইল না। ঘুমের একটি যাদুকরী শক্তি আছে। সুগভীর সুষুপ্তির পর মানুষ পরম প্রসন্নতায় জাগিয়া উঠে। কিন্তু পরদিন নিদ্রাহীন নীলিমা অপ্রসন্ন ও বিরক্ত-চিত্তে উঠিল। কাযেই স্বামীর সহিত বোঝাপাড়া হইয়া সে আপনাকে স্বামীর অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিল না।

জিতেশ অপ্রস্তুতভাবে পত্নীকে জানাইল, "কাল তুমি বেরিয়ে গেলে, আর অমনি নরনারায়ণ এল। নরনারায়ণ আর আমি একসাথে কলেজে পড়েছি—সে এখানে ডেপুটী হয়ে এসেছে। যাওয়ার সময় যে ভজুয়াকে ব'লে যাই, এ সময়ও দিলে না। তার পর ওকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ওর বাসায় যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ১০টা বাজে। ওর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। বৌটি খুব লক্ষ্মী, আমায় না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না, তাই রাত হয়ে গেল।"

নীলিমা অন্য প্রসঙ্গের বিন্দুমাত্র অবতারণা না করিয়া নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় ব'লে গেলে না কেন?"

কুণ্ঠিতভাবে জিতেশ বলিল, "নরনারায়ণ যে মোটেই সময় দিলে না। ওর বৌ বলেছে, তোমার সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে। ওর ভাল নামটা নরনাথ, কিন্তু একবার নরনারায়ণের পার্ট এমন অভিনয় করে যে, সেই থেকে ওকে আমরা নরনারায়ণ ব'লে ডাকি।"

"বেশ।" বলিয়া নীলিমা অন্যত্র চলিয়া গেল। স্বামীর বন্ধু-পত্নীর খুটিনাটি খবর জানিবার ঔৎসুক্য নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নারী-স্বভাবের সেই অদম্য কৌতূহল যখন নীলিমা জোরের সহিত সংবরণ করিল, জিতেশ বুঝিল, পত্নীর অভিমান হইয়াছে। কিন্তু বেচারী কৃষ্ণলীলাও শোনে নাই, বা চলচ্চিত্রে জয়দেবও দেখে নাই, কাযেই মানভঞ্জনের আইন-কানুন তাহার জানা ছিল না। ফাঁপরে পড়িয়া সে অগতির গতি নিজের পাঠ-কক্ষের শরণ লইল।

৫

কয়েক দিন পরের ঘটনা। ললিতা-দিদির আগ্রহাতিশয্যে নীলিমা নারী-সমিতির সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে সেখানে যাইতে হয়। নীলিমা দেখিল, স্বামী কয়েক দিন ধরিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর দেখাইতেছেন; কিন্তু তাহাতেও উভয়ের মনের ব্যবধান ঘুচিল না। নীলিমা তাই আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই ললিতা-দিদির ওখানে সকালে বিকালে যাইতে লাগিল।

কয়েক দিন প্রচুর বর্ষাপাতের পর সে দিন রৌদ্র অমল বিভায় জগৎ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। জিতেশ নীলিমাকে বলিল, "যাবে নীলি! ঐ পাহাড়টার ধারে বেড়িয়ে আসব'খন?"

স্বামীর কাছ হইতে এ প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত। নীলিমার অন্তরে আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল, কিন্তু কৃত্রিম ভাবগাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া সে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, "আমায় মাপ করো, আমার ললিতা-দিদির ওখানে একটু কায আছে।"

অপ্রতিভ না হইয়া জিতেশ বলিল, "বেশ, তা হ'লে আমি একাই বেড়িয়ে আসি। অনুমতি করছ ত?"

জিতেশের স্নেহোচ্ছ্বসিত সুরে নীলিমা মুগ্ধ হইয়া উঠিল। সহজ ও মোলায়েম করিয়া বলিল, "যাও, আমার 'পরে রাগ করছ না ত?"

জিতেশ হাস্য ও গাম্ভীর্য্য মিশাইয়া বলিল, "না লক্ষ্মি! তোমার আমার সম্বন্ধ ত রাগের নয়। সেই যে বলেছিলাম, 'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম,' সেই ঐক্যতান ত জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে।"

নীলিমা কথা বলিল না, গভীর শ্রদ্ধায় স্বামীর একান্ত-নির্ভর প্রেমকে অনুভব করিল। একবার মনে হইল, তাহার সমস্ত সংস্কার, সমস্ত নব্য আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া বলিয়া ফেলে—

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান।"

কিন্তু শুভ ইচ্ছা হইলেই মানুষ তাহা সকল সময়ে পূর্ণ করিতে পারে না। নীলিমার মনে "নোরার" বিদ্রোহী মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া ললিতা-দিদির ওখানে চলিল।

ললিতা-দিদির ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, অপূর্ব্ব বসিয়া চা খাইতেছে। ললিতা-দিদি বলিলেন, "নীলিমা, এই আমার বোন্‌পো অপূর্ব্ব রায়, একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক।" আর অপূর্ব্বকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি হচ্ছেন নীলিমা সেন—নারী-সমিতির কর্ম্মী সম্পাদিকা আর পরম বাগ্মী।"

অপূর্ব্ব হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, পরে মাসীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাসীমা! ওঁর জন্য এক কাপ চা আন্‌তে দিন।"

নীলিমা প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর্‌বেন, আমি চা খাই না।"

"সে কি! বিংশ শতাব্দীতে যে মধ্যযুগের কৃচ্ছ্রসাধন আনতে বসলেন? কারণ কি?"

নীলিমা লজ্জাসুন্দর কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাদের বাড়ীতে চায়ের রেওয়াজ নাই। আমার স্বামী চা খাওয়া অপছন্দ করেন।"

অপূর্ব্ব টেবলের বদলে টিপয় চাপড়াইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "দেখুন, এইটে আমার ভয়ানক অসহ্য—মানুষের আত্মাকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার চেয়ে পাপ কিছুই নেই—মুক্তির পতাকা আপনারা বইছেন—আপনাদের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা ও দাসীপণা দেখবো ব'লে আশাই করি নি। সকলের চেয়ে বড় কথা—আপনাকে জানুন। স্বামী কি বলেছেন, কি চেয়েছেন, কি ভালবেসেছেন, সেটাই কর্ত্তব্যনির্ণয়ের মাপকাঠি নয়। আপনি কি চান, কি ভালবাসেন, সেইটাই আপনার স্বকীয় ধর্ম্ম, আপনার 'ডিউটি'। আপনার সতীত্ব—আপনার মহত্ত্ব—মানুষের মুক্ত মনের এই যে বিরাট দাসত্ব, এই আমায় ভীষণ পীড়া দেয়। আমার সাহিত্যে তাই সকল সংস্কারকে ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে, নগ্ন স্বাধীনতার বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়েছি।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া অপূর্ব্ব দৃঢ়বিশ্বাসের অগাধ জোরে নীলিমার ব্রীড়াভিরাম মুখমণ্ডলের প্রতি সতেজ দৃষ্টিতে চাহিল। নীলিমা ধীরে ধীরে অপরাধীর মত জড়িতভাবে বলিল, "শুধু স্বামীর ইচ্ছা নয়, আমি নিজের ইচ্ছায় খাই না।"

অপূর্ব্ব বক্তৃতার ছন্দে বলিল.. "না, ঐখানে আপনার ভুল হচ্ছে—চিরন্তন সংস্কার আপনার কামনাকে রুদ্ধ ক'রে রেখেছে। আপনি অজ্ঞাতে আত্মপীড়া করছেন, কিছুতেই তা আপনি বুঝছেন না। আমার মতে এই বন্ধনের ব্যাধি থেকে দেশ উদ্ধার করাই সাহিত্যিক ও সংস্কারকের কর্ত্তব্য। শাস্ত্র, দেশাচার, মিথ্যা ভয়ের নাগপাশে দেশ মরতে বসেছে—এই জুজু থেকে সবাইকে বাঁচাতে হবে। আমার লেখার আমি পুনঃ পুনঃ এই বাণী প্রচার করেছি যে, জড় দাসত্বের চেয়ে বিশৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারও ভাল। মানুষ যতই গণ্ডী এঁকে নিজেকে বাঁধে, ততই সে মরে। যাক্, আপনার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। মাসীমা, তবে কিছু খাবার দিন।"

প্রথম পরিচয়ের আরম্ভেই অপূর্ব্বর এইরূপ বক্তৃতা ও মন্তব্য নীলিমা ঠিক শোভন বলিয়া মনে করিতে পারিল না।

মাসীমা খাবার আনিতে গেলেন। অপূর্ব্ব বলিয়া চলিল, "আমার 'নবযুগে' আমি এই কথা বলেছি যে, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই মানুষের ঐক্যতা ও পরিচয় জন্মেছে, হিন্দুজাতি যে মরেছে, তার এক কারণ তাদের ছত্রিশ রকম অন্নবিভাগ। আমাদের দেশ কোন দিনই সংঘবদ্ধ কায করতে পারিনি, তার কারণ, এক মানুষ আর মানুষের সাথে কখনও প্রাণের যোগে মিশতে পারে নি। ছোট ছোট দল গ'ড়ে এরা আত্মহত্যাই করেছে। মনে করুন, হিন্দুর এক সৈন্যদল গড়তে হবে—তাতে যুদ্ধাস্ত্রের যত বোঝা হক না হক, যোদ্ধাদের হাঁড়ীর বোঝা তার বেশী হবে।"

মাসীমা তিনটি প্লেটে করিয়া ল্যাংড়া আম কাটিয়া আনিলেন। মাসীমার অনুরোধে নীলিমা অপূর্ব্বর সাক্ষাতে আম্র খাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিল না।

মাসীমা বলিলেন, "নীলিমা, অপূর্ব্ব তার প্রবন্ধ শেষ করেছে, এবার একটা বড় সভা করতে হবে। সামনের ঝুলন-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় করলে খুব ভাল হবে।"

নীলিমা সোৎসাহে বলিল, "তা বেশ হবে, তা হ'লে নিমন্ত্রণপত্র ছেপে ফেলি। এবার একটু জাঁকালো ধরণের সভা করতে হবে, শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও ডাকতে হবে। তাঁদের কাছে আমাদের সমিতির বার্ত্তা বহন করতে হবে।"

ললিতা-দিদি বহু অভিঘাতে সংসারের পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এতটা কি পেরে ওঠা যাবে ?"

নীলিমা নূতন সম্পাদিকার নূতন উৎসাহে জানাইল, "নিশ্চয়ই হবে—ইচ্ছা করলেই সব সিদ্ধিই লাভ করা যায়।"

অপূর্ব্ব প্রশংসমান স্বরে উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনে আমার বিশেষ আনন্দ হচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু আপনি যদি ধৃষ্টতা না মনে করেন, তবে বলি, আপনার মত মহীয়সী নারী আমার চোখে পড়ে নি।"

কথার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল কি না, নীলিমা ধরিতে পারিল না। কারণ, কোনও ভক্তের প্রশংসা শুনিতে মনে সংশয়ের আবির্ভাব সহসা হয় না। তার পর নীলিমার নিজের আত্মাভিমান যথেষ্ট ছিল। তাহার মত রূপসী ও বিদুষী বাঙ্গালীর ঘরে দুর্ল্লভ, এ কথা অসত্য নহে। নীলিমার চিত্ত অপূর্ব্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

কিন্তু আলাপ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ভজুয়া দেখা দিল, "মাইজী, বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।"

ভৃত্যের কণ্ঠে স্বামীর আহ্বান যেন আদেশবার্ত্তার মত শুনাইল। স্বাধীনতার মূর্ত্ত বিগ্রহ অপূর্ব্বের কাছে উহা ব্যক্ত হওয়ায় নীলিমার অন্তর বিরস হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছীল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

"ডিপ্‌টী বাবু আর উন্‌কো মাইজী এসেছেন।"

নীলিমা বুঝিল, নরনাথ সস্ত্রীক আসিয়াছেন। পেলব করপল্লব তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া সে বলিল, "আজ তবে আসি।"

মাসীমা বলিলেন, "এ শিকার যেন হাত-ছাড়া না হয়, সভ্যতালিকার খাতা দিয়ে দেবো কি?"

নীলিমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, আজ থাক্।"

৬

নরনাথের মোটর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। পৌঁছিতেই একটি তরুণী হাস্যবিভাত-মুখে সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিল, "আসুন দিদি, আপনার ঘরে আপনাকে অভ্যর্থনা করছি।"

তার পর গড় হইয়া নীলিমার চরণ-ধূলি লইয়া প্রণাম করিল। নীলিমা আদরে তরুণীকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ও কি করছ বোন্, তোমার আত্মাকে হেয় ও লঘু করো না। চিরকাল মাথা নোয়াইয়া আমাদের মাথায় যথেষ্ট ধূলি জমে গেছে, সেগুলি এখন একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে।"

তরুণী দেবহূতি নরনাথের স্ত্রী। ক্ষণিক বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে নীলিমার সুষমাদীপ্ত মুখের পানে চাহিল, পরে বলিল, "না দিদি। আমি

ভাগবত-পড়া বাপের মেয়ে, তোমার এ কথায় সায় দিতে পারছি না। বাবা নরোত্তমের পদাবলী গাইতেন, তার এক যায়গায় আছে,...

'আর কবে হেন দশা হব
শ্রীব্রজের ধূলা ভূষণ করিব।'

ধূলাকে ত হীন ব'লে আমরা দেখতে শিখি নি।"

নীলিমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু আলোচনা বেশী অগ্রসর হইল না। হল-ঘরে পৌঁছিতেই দেখিল, দুই বন্ধু স্ফূর্ত্তিতে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছেন। নীলিমাকে দেখিয়া নরনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "নমস্কার, বৌদি! দাদাকে অন্ধকার কূপে ফেলে সকালে কোথায় গিয়েছিলেন?"

"এই পাশের বাড়ীতে, আমাদের নারী-সমিতির একটা বিশেষ অধি-বেশন হবে, বাঙ্গালার প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক অপূর্ব্ব রায় একটি প্রবন্ধ পড়বেন, তার সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।"

"কোন্ অপূর্ব্ব রায়? যিনি 'নবযুগ', 'বিদ্রোহ', 'মহামুক্তির ডাক' এই সব বই লিখেছেন ত?"

"হাঁ! বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান যুগে অমন লেখা আর কারও কলমে বেরোয় নি শুনেছি। আনকোরা সব নতুন ভাব দিয়ে ইনি দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন।"

"না বৌদি, আপনার মত হয় ত আমি সাহিত্যের জহুরী নই, কিন্তু ওদের লেখা প'ড়ে মনে হয়, এরা সব ভয়ঙ্কর জীব—নারী-মহলে এদের আনা ঠিক নয়, বৌদি।"

"কি বলছেন আপনি, বাঙ্গালার মনীষীরা এঁকে জয়মাল্য দিয়ে উৎ-সাহিত করেছেন।"

নরনাথ কৌতুকের সহিত বলিল, "মনীষীরা করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, এরা রিরংসার যে লেলিহান শিখা জ্বালছেন, তাতে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আগুন জ্বলবে।"

জিতেশ বাধা দিয়া বলিল, "ও তর্ক এখন থাক ভাই। নীলিমা! যাও ত, ওঁদের কিছু মিষ্টমুখের ব্যবস্থা কর গে।"

"কেন, ঠাকুরকে এতক্ষণ খাবার করতে বল নি?"

জিতেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "বলেছি।"

দেবহূতি পাশ হইতে বলিল, "ঠাকুর-চাকরের দ্বারা কি কিছু হয়? চল দিদি, দেখি, ওরা কি করছে।"

নীলিমা দেবহূতির সহিত ভিতরে চলিল; তার পর বলিল, "তোর নামটি কি, বোন্?"

"বাবা একটা সংস্কৃত নাম রেখেছেন দেবহূতি, সেটা শুধু পেঁটরা-ঢাকা কাশ্মীরী শাল, তার থাকার গৌরব লয়েই মুগ্ধ। আটপৌরে ব্যবহারের জন্য সবাই ডাকে দেবী ব'লে। আর উনি আদর ক'রে ডাকেন চেরী ব'লে।"

নীলিমা, দেবীকে প্রসন্ন বিস্ময়ের সহিত দেখিতেছিল। বড় ঘরের মেয়ে আর বড়লোকের ঘরণী, অথচ সজ্জায় তাহার যাদুকরী মোহ দেখাইবার চেষ্টা নাই। নীলিমা উঁচু হিল-দেওয়া জুতা মসমস্ করিয়া চলিয়াছিল। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, দেবী খালি পায়ে চলিয়াছে, গহনার বাহুল্য নাই, হাতে চারিগাছি করিয়া হাতীর দাঁতের বাধান কারুকার্যময় শাঁখা, পরনে একখানি দামী শান্তিপুরে ধুতি। সীমন্তের উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। মেয়েরা আজকাল প্রায় সিন্দূর পরা ছাড়িয়াছে বলিলেই হয়।

দেবীর সীঁথির প্রশস্ত সিন্দুর-রেখা যেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ। নীলিমার একবার মনে হইল, হয় ত গেঁয়ো ভূত, সহুরে নূতন তরিবৎ কিছুই জানে না। কিন্তু তাহার অনুমান সত্য নহে। তরুণীর চালচলনের মধ্যে এমন একটি মাধুর্য্য ও এমন সাবলীল গতি আছে, যাহা ভদ্রসমাজের সহবৎ হইতে জাত। নীলিমা অনুমান করিল, ভাগবত-পড়া পিতার কন্যা, প্রাচীন রীতির প্রতি শ্রদ্ধা পিতা হইতে পাইয়াছে, আর নূতনের হাব-ভাব স্বামীর কাছে শিখিয়াছে। সে যাহা হউক, দেবহূতির বৈশিষ্ট্য নীলিমাকে মুগ্ধ ও প্রীত করিয়া তুলিল।

রান্নাঘরে যাইয়া দেখা গেল, সিঙ্গেড়ার পূরের জন্য যে আলু কোটা হইয়াছে, তাহা ধোয়া সত্ত্বেও একরাশ ধূলা-ভরা, আর ময়দার লেচিগুলি এমন একখানি ময়লা তাওয়ার উপর রাখিয়াছে যে, দেখিলে বমির উদ্রেক হয়। রান্নাঘরটি ঝুল-কালীতে ভরা, হাড়ী নেতা এমন অপরিষ্কার যে, নীলিমারই মনে লজ্জার সঞ্চার হইল। পূর্ব্বে অবশ্য নীলিমা রান্নাঘরের তদারক করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। রান্না-ঘরের এই শোচনীয় মলিনতা আজ সর্ব্বপ্রথম নীলিমার গণ্ডদেশকে আরক্ত করিয়া তুলিল।

দেবী তাহার অনুপম স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "দিদি বুঝি হেঁসেল দেখতে সময় পান না?"

নীলিমা আমতা আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ বোন্, কত কায করতে হয়।"

দেবী তর্কের দিকটা এড়াইয়া জানাইল, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপন হাতে রেঁধে ও তদারক ক'রে স্বামীকে না খাইয়ে আপনি কেমন ক'রে তৃপ্তি পান? আমি ত পারি না।"

নীলিমা উত্তর দিল না। ঠাকুরকে সরাইয়া নিজেই সিঙ্গেড়া করিতে বসিল। দেবী পাশে বসিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। ক্ষিপ্র হস্তে কায করিয়া যখন এক কাপ চা ও দুইখানি প্লেটে করিয়া সিঙ্গেড়া আনিয়া হল-ঘরে পৌঁছিল, তখন নীলিমা শুনিতে পাইল, নরনাথ বলিতেছে, "না ভাই, প্রেম-সাধন সহজ নয়। কৃচ্ছ্র-সাধন চাই, কেবল উপনিষদের পাতায় মসগুল থেকে নারীর চিত্ত জয় করা যায় না, চেষ্টা ও প্রযত্নের দ্বারা প্রেম জয় করতে হয়।"

ভাগ্যে দেবী সঙ্গে আসে নাই! সে তখন ঠাকুরকে বকিয়া-ঝকিয়া হেঁসেল-রক্ষার বক্তৃতা করিতেছিল। আত্ম-সংবরণ করিয়া নীলিমা চা লইয়া প্রবেশ করিল।

জিতেশ নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠাকরুণ কৈ? তাঁর খাবার এখানে দিতে বল্লে না কেন?"

নীলিমার কথা বলিবার পূর্ব্বেই নরনাথ বলিল, "সে গুড়ে বালি। সাধ্য-সাধনা করেও তাঁকে সঙ্গে ব'সে খাওয়াতে পারি নি। দেখুন বৌদি, ওকে যদি বুঝিয়ে আপনার সমান অধিকারের বাণী শিখিয়ে দিতে পারেন!"

নীলিমা বুঝিল, ইহা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গমাত্র। পত্নী-গৌরবের জয়োল্লাসের দর্পে গর্ব্বিত স্বামীর উক্তি। বৃশ্চিক-দংশনের মত জ্বালা অনুভব করিয়া নীলিমা ক্রুদ্ধ-কৌতুকে বলিল, "না ঠাকুরপো! আপনার প্রাণের দেবী আমাদের সংস্পর্শে কলুষিত হয়ে যাবেন, সে কি আপনি সহ্য করতে পারবেন?"

নিজের কথার ঝাঁঝ নিজেই অনুভব করিয়া নীলিমা কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "তবে বোনটিকে দিন, আমাদের সমিতির সভ্যা ক'রে নি।"

নরনাথ আঘাতকে উপেক্ষা করিয়া বলিল, "আমার মতের চেয়ে বোধ হয় আপনার বোনের 'স্বাধীন মত' লওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, আপনাদের মতে আমরা ত আর এখন মালিক নই, তবে আমার অনুমান, উনি ভীতা হরিণীর মত আপনাদের সমিতিকে ব্যাঘ্র ব'লে ভয় পেয়ে যাবেন।"

নীলিমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনার রসজ্ঞতা প্রশংসনীয়।"

নরনাথ প্রত্যুত্তর দিল. "আপনি যদি তারিফ করেন, তবে একটা শিরোপা দিয়ে দিন। জানেন কি বৌদি! দাদার মত উপনিষদের অমৃত-রসে মসগুল হ'তে পারি নি, কাছারীর নরক গুলজার থেকে ঘরে ফিরে ফষ্টিনষ্টি করেই দিন কেটে যায়। তবে 'ভাগবত-পড়া বাপের মেয়ের' দৌরাত্ম্যে বকাটে মেরে যাই নি। কাযেই 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' করেই দিন চ'লে যাচ্ছে। একটা কথা কি জানেন, বৌদি! উনি আমার সবে-ধন নীলমণি, সভাসমিতিতে ছেড়ে দিতে একটু শঙ্কাই হয়।"

নীলিমা বুঝিল, নরনাথের সহিত কথায় আঁটিয়া উঠা তাহার পক্ষে অসাধ্য, কাযেই সে চুপ করিয়া রহিল।

দেবী ঘরে আসিল। নীলিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল, দিদি! আজ আসি এখন।"

"এর মধ্যেই যাবি, বোন্?"

"হাঁ দিদি, উপায় নেই, তোমায় ত বলেছি, বাসায় ফিরে 'রাঁধুনীগিরি' করতে হবে।"

মোটরে পৌঁছাইয়া দিয়া জিতেশ বলিল, "মাঝে মাঝে আসবেন, বউ-ঠাকরুণ।"

জিতেশের আহ্বানের কাতরতা তাহার অন্তরের উদাস রিক্ততাকে

প্রকাশ করিয়া তুলিল। নরনাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। নীলিমাও বলিল, “অবসর পেলেই আসবি, বোন্। তোদের বাসা যে দূরে, আমি ত আর রোজ রোজ যেতে পারবো না।”

দেবহুতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, “সময় পেলেই আস্‌বো দিদি, নিশ্চয়।”

মোটর চলিয়া গেল। জিতেশ ও নীলিমা বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মনে তখন যে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহা দুই বিচ্ছিন্ন বালুচরে নিরাশায় আছড়াইয়া মরিতেছিল।

৭

ঝুলন-পূর্ণিমার সভাকে পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গশোভন করিবার জন্য নীলিমা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। ছোট সহরে রীতিমত হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। প্রাচীনপন্থীরা ব্যাপারটি বাড়াবাড়ি মনে করিয়া নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তরুণের দল আর সহজপন্থী নিরুপদ্রব জীবন-যাপনকারীরা সভার উৎসবকে আনন্দ ও উল্লাসের সহিত গ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব ও নীলিমার মধ্যে ললিতা-দিদির বাড়ী অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। অপূর্ব্বের উত্তেজনাপ্রদ অভিনব মতবাদ সর্ব্বান্তঃকরণে সে সমর্থন করিতে না পারিলেও, মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাহার বক্তব্য শুনিয়া যায়।

মিশনারী টমসনের পত্নী মিসেস্ টমসন সভানেত্রীর কায করিতে স্বীকৃত হওয়ায় সভায় বহু লোকজনসমাগম হইল। পত্রপুষ্প-শোভিত মণ্ডপে সহরের মহিলারা ও বিশিষ্ট ভদ্র মহাজনগণ সমবেত হইলেন।

ললিতা-দিদি প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ করিয়া নীলিমাকে সভার ইতিহাস পড়িতে বলিলেন। নীলিমার সরল সহজ সুন্দর ভাষা সকলকে মুগ্ধ করিল। তাহার পর তাহার বলিবার ভঙ্গীটিও বিচিত্র। সকলেই আগ্রহভরে তাহার পঠিত কার্য্য-বিবরণী শুনিল।

নীলিমার বলা শেষ হইলে অপূর্ব্ব উঠিল। অপূর্ব্বের সজ্জা সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তাহার মাথায় বিবেকানন্দী পাগড়ী, গায়ে গরদের মিরজাই, পায়ে দিল্লীর নাগরা— চোখে 'Tortoise-shell'এর চশমা।

অপূর্ব্বের ভাষায় কিছু ন্যাকামী আর মোলায়েম মেয়েলী ভাব থাকিলেও তাহার গলার জোরে সমস্ত বক্তৃতাটি ভাস্বর হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, "আমি একেবারে নতুন কথা বলতে চাই। সতীত্বের যে পচা আদর্শ আমাদের মনকে পঙ্গু করেছে, সেটাকে ভাঙ্গতে হবে। একপতিত্বের যে সংস্কার মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে, সেটা একটা অন্ধ বিশ্বাস। মা হওয়াই আর দাসীপণা করাই নারীত্বের জয়বার্ত্তা নয়। মানুষ হওয়াই আর জীবনের আনন্দকে পাওয়াই তার সাধনা। পৃথিবীতে আজ এই মহাসাম্যের বাণী জানাতে হবে। পুরুষ যদি এখনও সাবধান না হয়, তবে নারীর জাগ্রতশক্তি তাকে পিষে মেরে ফেলবে—নারীর ভবিষ্যৎ আশার উজ্জ্বল এক দিন আসছে—যে দিন নারীর অবদান মানুষের কৃষ্টিকে সফল ক'রে তুলবে। তাই ভাবী যুগের নবী হয়ে বর্ত্তমানের নারীকে আমি বল্‌তে চাই—মোহকারা ভাঙ্গুন—আত্মপ্রতিষ্ঠ হন, সমস্ত বন্ধনের বেড়া সবলে ভেঙ্গে মুক্ত স্বাধীনতার মুক্ত আকাশতলে বেরিয়ে পড়ুন—নারীর পতি-সেবাই বড় নয়, নারীর সতীত্বই শ্রেয়ঃ নয়, নারীর মাতৃত্বই তার কাম্য নয়, নারীর আত্মার স্ফুরণ চাই—ব্যক্তিগত জীবনে আনন্দের উদ্বোধন চাই—"

অপূর্ব্বের সমস্ত বক্তৃতার উহাই সারাংশ। বক্তার নির্ভীক মতবাদ সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রবীণগণ ব্যতিব্যস্ত হইলেন, বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এবার হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল।" তরুণ ও তরুণী-দিগের একদল ঘন ঘন হাততালি দিয়া বক্তাকে অভিনন্দিত করিয়া তুলিল।

বুড়া উকীল পরেশ বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, "স্বৈরাচার যে পৌরুষ নয়, এ কথা বক্তা ভুলেছেন—নারীর আত্মা প্রেমের ও মাতৃত্বের মধ্যেই স্ফূর্ত্তি পায়—আত্মার স্ফুরণ ব'লে বক্তার যে লম্ফঝম্প, তাহা আকাশকুসুম, এ কথা সবাই যেন মনে রাখেন!"

বক্তৃতা কিন্তু বেশী দূর চলিল না—চারিদিকে সমালোচনা, বিদ্রূপ জঁাকাল হইয়া উঠিল। কেহ বিড়াল ডাকিল, কেহ শিয়াল ডাকিল, কেহ চেয়ার উল্টাইল, কেহ টেবল চাপড়াইল।

মিসেস্ টম্‌সন উঠিলে গোল থামিল। কিন্তু বহুলোক তখন সভাস্থলকে কেচ্ছা মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মিসেস্ টম্‌সন ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আজ এখানে যেরূপ রীতি দেখিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়া মনে হয় না। বাগ্মী ভাল বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁর মত যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার মত বাঙ্গালী-সমাজে বিষের কায করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশের সতীত্বের আদর্শ মহান্। বর্ত্তমান সমিতি সেই প্রাচীন সংস্কৃতি অবলম্বন করুন। আমি আপনাদের শুভকামনা করি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে যে যাহার স্থানে ফিরিয়া চলিল।

৮

ললিতা ও নীলিমা প্রথমে মনে করিয়াছিল, হয় ত তাহারা একটি বড় কায করিয়াছে ; কিন্তু যখন দলে দলে অনেক সভ্যা নাম কাটাইতে বসিল, তখন তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই মাসীমা, নূতন বাণীর বার্ত্তা যারা বয়, ভয়-ডর তাদের নেই, সেই অভয়-মন্ত্র মনে থাকলে লক্ষ পরাজয়েও দমবেন না।"

ললিতার মনে খুব বেশী শান্তি হয় না। শিক্ষয়িত্রী তিনি, বুড়া বয়সের দিনগুলি হৈ-চৈ করিয়া কাটাইবেন ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু অকস্মাৎ বিজয়ীর বেশে পরাজয় দেখা দিল। তরুণীদের কাহারও কাহারও উৎসাহ ও উল্লাস থাকিলেই ত সমিতি চলে না ; কর্ত্তাদের অর্থ সদরে হউক কি মফঃস্বলে হউক, এক গিন্নী-বান্নী মানুষেই দিতে পারে, কাযেই ললিতা নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন।

নীলিমার মন উত্তেজনার পর অবসাদে আর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অপূর্ব্ব তাহাকে ছাড়ে না ; দেবহূতির চরিত্র-মাধুর্য্য নীলিমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে তাহার মত করিয়া, স্বামীর চিত্ত-রাজ্য জয় করিয়া রাজ-রাজেশ্বরী হইবে, এ সদিচ্ছা জাগিয়াছিল, কিন্তু সুযোগ জুটে না। সময়ে ও অসময়ে ললিতা-দিদি ডাকিয়া পাঠান, নিজের নৈরাশ্যের নিরাকরণ জন্য, আর অপূর্ব্বের অনুরোধে।

অপূর্ব্ব বলে, "দেখুন, আপনার সাথে আমার পরিচয় হয় ত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। আমি এসেছিলুম কল্পনার মসল্লা খুঁজতে,

পেয়ে গেলুম মনের মানসী। আপনার বন্ধুত্ব আমার দিব্য চোখ খুলে দিয়েছে। আপনার অনুমতি হ'লে আমার ভাবী কাব্য-সাধনা আপনাকে উৎসর্গ ক'রে ধন্য হবো।"

নীলিমা অপূর্ব্বের দৃষ্টিতে শঙ্কিত হইয়া উঠে। প্রতিদিনই ভাবে, আর যাইবে না, কিন্তু এ যেন কুহকীর কুহক-আকর্ষণ, বশীকরণের মন্ত্রে যেন টানিয়া লয়।

নীলিমার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে একান্ত নির্ভর প্রেম আর ব্যক্তিত্বের গর্ব্ব ও অভিমানে যে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তাহার সুমধুর প্রকাশ রূপদক্ষ অপূর্ব্বকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

কেবল রূপসী ও শিক্ষিতা হইলেই হয় ত এত মোহ জন্মিত না, নীলিমার মধ্যে অসাধারণত্ব দেখিয়া অপূর্ব্ব পোকার মত আলোশিখার উপর ঝাঁপ দিতেছিল।

অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব ভাবিয়া অগ্রসর হয়। নীলিমার মনোমোহন রূপ, রসজ্ঞ আলাপ আর সর্ব্বোপরি অবিচল সাহস ও কুণ্ঠাহীন আত্মপ্রকাশের ভাব অপূর্ব্বকে এক নূতন রসের ও এক নূতন লোকের সন্ধান দিয়াছিল।

কিন্তু মানুষের মনে কখন্ যে রং ধরিয়া যায়, কে জানে? অপূর্ব্বও হয় ত জানিল না যে, তাহার দাবী বন্ধুতা ছাড়াইয়া অনেকদূরে অগ্রসর হইয়াছে।

অপূর্ব্ব এক দিন স্বেচ্ছায় জিতেশের সহিত দেখা করিল। জিতেশ তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। কথায় কথায় জিতেশ বলিল, "আপনার নাম যথেষ্ট শুনেছি, কিন্তু কথাসাহিত্য আমার মনের মাঝে কোন ছাপ দেয় না, তাই ওগুলি পড়তে পারি না!"

অপূর্ব্ব সোৎসাহে বলিল, "কিন্তু কথা-সাহিত্য বর্ত্তমানের যুগ-সাহিত্য; কাব্য ও নাটকের যুগ চ'লে গেছে, এখনকার যুগবার্ত্তা উপন্যাসের মাঝেই লোকের দ্বারে পৌছে—"

"হবে হয় ত! সংসারের গতি-চক্রের পিছনে প'ড়ে মহা মুস্কিল হয়েছে, অপূর্ব্ব বাবু! আমার স্ত্রী চলেছেন ভাবী পঞ্চবিংশ শতাব্দীর ভাব ও আশা নিয়ে, আর আমি হয় ত' চলেছি পঞ্চদশ শতাব্দীর স্থিতি নিয়ে। তাই সময় সময় ভাবি যে, একবার সমসাময়িক মানুষের মনের খবর লই। আপনার দু'একখান বই এবার প'ড়ে দেখবো।"

"আপনার স্ত্রী-সৌভাগ্য অসীম। বাঙ্গালাদেশে ত কম ঘুরি নি। সাহিত্যের উপাদানের জন্য কত যায়গায় গিয়েছি; কিন্তু আপনার স্ত্রীর মত এমন জীবন্ত নারী দেখি নি—"

জিতেশ জিজ্ঞাসুর মত বলিল, "নীলিমার সাথে আপনার আলাপ হয়েছে? ওঃ, তাই বলুন। ভজুয়া! ভজুয়া! তোর মাইজীকে বল্, অপূর্ব্ব বাবু এসেছেন।"

অপূর্ব্বের মনে হইল যে, তাহাদের পরিচয় কেতাদুরস্ত হয় নাই, তাই বলিল, "পরিচয় হয়েছে বল্লে ভুল হবে, তবে মাসীমার ওখানে ওঁকে বহুবার দেখেছি। নারী-সমিতির সম্পাদিকা হিসাবে ওঁর কায দেখবার সুযোগ হয়েছে। আশ্চর্য্য শক্তি ওঁর!"

"আপনার কুণ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমার স্ত্রী পর্দ্দাকে মানেন না। সুতরাং পূর্ব্বে পরিচয় হওয়ায় ক্ষোভের কারণ নাই।"

জিতেশ অপূর্ব্বের কথিত পত্নীর গুণগ্রাম শুনিয়া পুলকিত হইল। কোন্ স্বামীই বা না হন? জিতেশ মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে

লাগিল—"হায়, জগতের সকলেই নীলিমার প্রশংসা করে, আর সেই শুধু তাহাকে অবহেলা করে।"

নীলিমা আসিল। গরদের শাড়ী পরিয়া সে মহিম্নস্তোত্র পড়িয়া মনকে শান্ত করিতে যাইতেছিল। অপূর্ব্বের আগমন তাহাকে খুসী করিল না। নীলিমা আসিতেই জিতেশ সোৎসাহে বলিল, "দেখ, ওঁর দু'একখানি বই আমায় পড়তে দিও ত। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে বড়ই আপ্যায়িত হয়েছি।"

নীলিমাকে উত্তর দিতে না দিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "সে জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, আজই আমার প্রকাশককে লিখছি, আমার এক সেট বই আপনাকে পাঠিয়ে দেবে।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু—"

"না জিতেশ বাবু, এতে কিন্তু করবেন না। স্বল্প পরিচয়ই মানুষকে দূর করে না। আপনার মধুরতা আপনাকে আমার নিকট ক'রে তুলেছে।"

নীলিমা জিতেশকে বলিল, "কিন্তু ওঁর বই তোমার ভাল লাগবে না। বিদ্রোহের বজ্রবাণী শুনে তুমি চমকে উঠবে। থাক না কেন—"

জিতেশ পত্নীর সম্মতির আশায় বলিল, "আমি মনে করছি যে, দু'চার-খান প'ড়ে দেখি। যে যুগে বাস করছি, তার মনোভাব জানাও ত দরকার। সত্য অবশ্য শাশ্বত ; কিন্তু যুগভেদে তার প্রকাশ ত বিভিন্ন হয়ে দেখা দেয়।"

"তবে পড়ো, কিন্তু এ সব বই পড়লে তুমি অসুস্থ ও অসুখী হবে।"

পতি ও পত্নীর হৃদ্যতা অপূর্ব্বকে হাসাইয়া তুলিল। কিন্তু নীলিমার কথাগুলির সদর্থ সে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাই সংশয়াকুল-চিত্তে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য সে বলিল, "শুনুন জিতেশ বাবু, আপনার যথেষ্ট পড়াশুনা আছে। এমন এক দিন ছিল, যখন পথে ঘাটে মানুষ

ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠত, পুষ্প-নৈবেদ্যে ভূতপূজা কোরতো ; আজ ভূত নেই বল্লে, কেউ মারবে না, কিন্তু সে যুগে যদি কেউ বলতো, তবে তাকে হয় ত জীবন্তে গোর দেওয়া হ'ত। আজ স্থিতির সমাজে আমাদের বাণী হয় ত বিপ্লবের ও বিশৃঙ্খলার দ্যোতক ব'লে ভুল হ'তে পারে, কিন্তু মহাকাল অতন্দ্র জেগে আছেন, আমাদের বার্ত্তা হয় ত এক দিন মানুষ মেনে নেবে।"

জিতেশ বলিল, "ঠিকই ত, বেদের কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে যদি মানুষ ব'সে থাক্‌তো, তা হ'লে কি আর উপনিষদের তত্ত্ব জাগ্‌তো ? ক্রম-বিবর্ত্তন হচ্ছেই ত।"

অপূর্ব্ব বলিল, "বা ! আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, আপনি যুগসাহিত্য না প'ড়ে যুগের মর্ম্মবাণীটি অধিকার ক'রে নিয়েছেন।"

জিতেশ বলিল, "নীলিমা, ঠাকুরকে চা দিতে বলো।"

নীলিমা বলিল, "তোমরা গল্প করো, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার একটু কায আছে।"

অপূর্ব্ব জানাইল, "ক্ষমা করবেন, জিতেশ বাবু ! আপনারা ত কেউই চা খান না, চায়ের দরকার নেই। সন্ধ্যা হয়েও এলো, আজ উঠি, নমস্কার।"

জিতেশ প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "অবসর পেলেই আসবেন।"

৯

কয়েক দিন ধরিয়া আকাশে অনবরত জল ঝরিতেছিল। মহুয়া ও শাল-বনের কালো তরুরাজি কালো মেঘে শ্যামতমালকুঞ্জ বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। জিতেশ বাহিরপানে চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর সম্মুখে মাঠের

পর মাঠ চলিয়াছে, তাহাতে ধানের কচি শিশুগুলিরা মাথা তুলিয়া আনন্দ জানাইতেছে। বর্ষার দিনে প্রিয়জনের সঙ্গ মানুষের প্রিয়তম হইয়া উঠে, কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া নীলিমার ভারাক্রান্ত মন দেখিয়া বেচারী তাহার হদিস পাইতেছিল না। কাযেই উদাস আলস্যে সে মেঘের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতর নীলিমা আপন বিছানায় শুইয়া ছিল। তাহার মনে একটা দুশ্চিন্তা নানাভাবে ঘোরাফেরা করিতেছিল। অপূর্ব্ব তাহার জন্য যে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নীলিমা বুঝিতে পারিয়াছে। যৌবনের ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা এই যুবকের চোখে মুখে দেখিয়া সে সংকল্প করিয়াছে যে, আর নহে, এইবার স্বামীকে বলিয়া অপূর্ব্বকে দূর করিয়া দিবে। কিন্তু পারে নাই। প্রথমতঃ স্বামী ও স্ত্রীর যে সুনিবিড় ঐক্য উভয়কে একান্ত আপন ও একাত্ম করিয়া তুলে, তাহাদের তাহা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ নীলিমার দৃঢ় সংস্কার, নারীকে পুরুষের সঙ্গে অবাধভাবে মিশিয়া নারীর অধিকার সপ্রমাণ করিতে হইবে।

নীলিমার মনে তখনও কোন দাগ পড়ে নাই, কিন্তু অপূর্ব্বের বাক্যে এমন এক যাদু আছে—যাহা নীলিমাকে বিমোহিত করিয়া ফেলে। নীলিমা তাই ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না।

ভোঁ ভোঁ শব্দে মোটর বারান্দার ধারে থামিল। নরনাথ সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিল। জিতেশ আগু বাড়াইয়া বলিল, "আসুন বৌঠাকরুণ, ভাল আছেন ত?"

দেবহূতি সসম্ভ্রমে বলিল, "হাঁ, দিদি কোথায়? বাড়ীর ভেতর আছেন, না বেড়াতে গেছেন?"

জিতেশ ম্লানকণ্ঠে উত্তর দিল, "না, ভিতরেই আছেন।"

দেবহূতি বক্তার বেদনার্দ্র স্বরে ব্যথিত হইয়া উঠিল। পতির বন্ধুর এই অনর্থক মানসিক দুঃখ কিছু দূর করা যায় কি না, তাই ভাবিতে ভাবিতে অনুকম্পার আবেগে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনারা গল্প করুন, আমি দিদির কাছে যাই।"

নরনাথ বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যা ফ্যাঁসাদে পড়া গেছলো ভাই, দশ দশটা Bad livelihood কেস করবার জন্য এ কয় দিন মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে প্রাণ হায়রাণ হয়ে গেছে।"

জিতেশ বলিল, "কৈ? আমি ত কিছুই জানি নে, তা বৌঠাকরুণ কি একলা বাসায় ছিলেন?"

নরনাথ হাসিয়া বলিল, "না, সে কি হবার যো আছে। চোখের আড়াল হলেই যদি মনের আড়াল হয়ে যাই, এই ভয়ে উনি কি আর ছেড়ে দেন? এ কি যেমন তেমন গিরো—"

জিতেশ গম্ভীর হইয়া উঠিল। এই দম্পতির জীবনের সুখচিত্রের সহিত নিজেদের পারিবারিক ঔদাসীন্যের তুলনা করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। নরনাথ কথা বলিয়া চলিল, "ছোটবেলায় এক কীর্ত্তনীয়া গান গেয়েছিল,—

'না বল না বল সই না বল এমনে
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে।'

কিন্তু এমন বর্ষার দিনে গরম গরম ফুলুরী না হ'লে আর মৌতাত হচ্ছে না। কোথায় গেল তোর চাকরটা। ওরে ভজুয়া, যা, মাইজীকে ফুলুরী ভাজবার হুকুম দিয়ে আয়।"

জিতেশ বলিল, "বেশ আছিস ভাই, কেমন করলে তোদের মতন অমন স্ফূর্ত্তির জীবন পাই, বল ত? আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, কিছুই আর ভাল লাগছে না!"

"বলিস কি ভাই, এর মধ্যেই বৈরাগ্যের সুর ধ'রে ফেল্লি যে? কেন, ব্যাপার কি? অভিমানের পালা চলছে বুঝি? ভাল কথা, সহরে এসে শুনেছি যে, সেই অপূর্ব্ব ছোঁড়াটার সঙ্গে বৌদিদির খুব ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে। এ কিন্তু ভাল নয়।"

জিতেশ বলিল, "অপূর্ব্ব আমার সাথে এসে আলাপ করেছে, ওকে ত বেশ রসজ্ঞ স্রষ্টা ব'লে বোধ হয়।"

নরনাথ সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার সরল মনে ধূলি দেওয়া মোটেই কঠিন কায নয়, বন্ধু। আমি বল্‌ছি না, কোন কিছু খারাপ হয়েছে, কিন্তু যারা নিজেরা রিরংসার সাহিত্য রচনা করছে, তাদের কাছ থেকে কি মহত্ত্ব আশা করা যায়? আর কেউ করে করুক, আমি করি না।"

জিতেশ বলিল, "ওর বইগুলি আমায় উপহার দিয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ত ভাই আমি পড়ি না, কাযেই এগুলো আমার কাছে একেবারে আশ্চর্য্য লাগছে। এরা কেবল ভাঙ্গতে চাচ্ছে, গড়বার মতলব নেই। যৌন-লালসার যে কলুষ এই লেখার পাতায় পাতায় বিষের মতন ছড়ানো, তাতে মানুষের দম আটকে যায়। প্রাচীন সাহিত্যে অশ্লীলতা আছে, কিন্তু তার মধ্যে এত বিষ ছিল না। তবে ছেলেটির লেখার জোর আছে, ভাই।"

"ঐ ত খারাপ করেছে। যে কামনার জ্বালা এদের শক্তিশালী লেখা জ্বালছে, সংযমের কোনও শান্তিবারিতে তা নিভবে না—এই সব ছাগ-সাহিত্য মানুষকে ছাগ ক'রেই তুলবে।"

ওদিকে দেবী যাইয়া দেখিল, নীলিমা বিছানায় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছে। দেবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি দিদি, আজ যে যোগিনী-বেশ? অন্তরে কি আজ রাধার ব্যথা লেগেছে নাকি? কেন, শ্যামরায় ত ঘরেই আছেন। বাতায়নের ফাঁকে মেঘের ধ্যান করবার দরকার কি?"

নীলিমা উঠিয়া বলিল, "ঐ ইজিচেয়ারটায় বস. বোন্, আজ শরীরটা তত ভাল নেই, তাই শুয়েছিলাম।"

দেবহূতি নীলিমার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি?"

নীলিমা চকিত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল্ না, বোন্।"

"আচ্ছা, এ তোমাদের কেমন ব্যাভার? তোমার অসুখ হয়েছে অথচ উনি কিছু জানেন না ব'লে মনে হ'ল; সত্য কি তোমাদের মনের মিল হয় নি?"

নীলিমার চক্ষু হইতে উদ্যত অশ্রু উদ্গত হইল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "অমিল নেই, তবে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। আমি চাইনে যে, আমার স্বাধীন অস্তিত্ব, আমার মৌলিকতা বিনষ্ট হয়ে যাক। তোমাদের মতন আত্মসমর্পণ করাকে আমি হেয় ও দাসীপনা মনে করি। বর্ত্তমানের নারী শুধু করঙ্কবাহিনী হয়ে তৃপ্ত হবে না। সে তার লুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে বিশ্ব-প্রগতিকে সফল ও সুন্দর ক'রে তুলবে।"

দেবহূতি সস্মিত-মুখে বলিল, "না দিদি, আমার ভয় হয়, এ তোমার অন্তরের কথা নয়। শেখা বুলি দিয়ে তুমি আপন আত্মাকে রিক্ত ও কাঙ্গাল ক'রে রেখো না। সৃষ্টি যত দিন থাকবে, তত দিন পুরুষ ও নারীর মিলতে হবে। এ মিলন যাতে সুন্দর ও কৃতার্থ হয়ে ওঠে, তারই জন্য

সমাজের রীতি ও নীতির সৃষ্টি। দুই জনের প্রেমে অদ্বৈত হয়ে যাওয়াই আদর্শ। কাযেই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, দিদি, তুমি মিথ্যা চীৎকার করছ?"

নীলিমা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কিন্তু তুমি কি বলবে না যে, আমাদের দেশের নর-পশুরা নারীর আত্মাকে জুতার তলায় পিষে মেরেছে?"

"স্বীকার করবো না কেন, পৃথিবীতে মিথ্যা ও অমঙ্গল আছে, কুৎসিত ও অসুন্দর আছে; তা নারীরও আছে, নরেরও আছে।"

"কিন্তু বোন্, তুমি যদি চোখ খুলেও অন্ধ হও, তা হ'লে আর কি করব! আমাদের সমাজ-বিধি কি নারীর সমস্ত হৃদয় মন, বুদ্ধি, সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে নারীকে ব্যভিচারের পুতুল ক'রে রাখে নি?"

দেবী বলিল, "দিদি, তোমার মত বেশী পড়া-শুনা হয় ত করি নি। পশ্চিমের খবর ভাল জানি নে, কিন্তু আমাদের সমাজের যে দুর্ব্বলতা, তা জাতির দুর্ব্বলতায় হয়েছে। তবে কাযের যায়গায় গরমিল ও ফাঁকি অনেক পেলেও, আদর্শকে ফাঁকি বলবে কি ক'রে? আমাদের দেশের ঘরে ঘরে এখন যে উজ্জ্বলমধুর দাম্পত্য-প্রেম আছে, পৃথিবীতে তার তুলনা আছে? উনি সে দিন একখানি বই প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। তাতে বাইরের যে খবর শুনি, তাতে গা শিউরে উঠে। কিন্তু বেশী তর্ক করতে চাই না, তর্কে তোমায় হারাবো, সে ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দিদি! এই Amazon সেজে কি তৃপ্তি পেয়েছ? কর্ত্তার মুখের কালো মেঘ দেখে মনে হয়, তিনি ত পান নি; আমি জানতে চাই, তুমি পেয়েছ কি না?"

নীলিমা ফাঁপরে পড়িল। যে প্রেমানন্দে দেবী বিভোর ছিল, তাহার কণাংশও তাহার লাভ হয় নাই। স্বামীর হৃদয়-ভরা অগাধ প্রেম, অথচ

সে ক্ষুব্ধ ও তৃষিত। দোষ যে তাহার একার, তাহা নহে ; জিতেশও প্রেমের প্রকাশরীতি জানিত না। তথাপি যে গভীর পরিপূর্ণতায় দেবীর সারা চোখে-মুখে আনন্দ-দ্যুতি জ্বলিতেছিল, তাহা সে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে দেখিতেছিল। নীলিমা দৃষ্টি নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দেবহূতি জয়োল্লাসে অধীর হইয়া বলিল, "জানি দিদি, তুমি অসত্য বল্‌বে না। তুমি অতৃপ্ত ও অশান্ত হয়ে ছুটেছ মিথ্যা বুলির মরীচিকার পিছনে। ছুটেছ ব'লেই দিনে দিনে ক্লান্ত হয়ে উঠছ।"

"তুই বোন্ কি সুখী হয়েছিস্?"

দেবহূতি দৃপ্ত গৌরবে বলিল, "অসুখী হয়েছি বল্‌লে যে তোমার ঠাকুর-পোর ভয়ানক অপমান করা হবে। আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, কিন্তু দিদি! কৈ, দাসী ব'লে ত নিজের 'পরে অবজ্ঞা হয় না।"

নীলিমা বলিল, "তোদের প্রেমের কথা শুনলে আমার হিংসে হয়—"

"হিংসে ক'রে কি হবে, দিদি! তোমার ঘরেই ত তোমার প্রিয়তম অতিথি হয়ে রয়েছেন। তুমি যে হেলা ক'রে অচল সৌভাগ্যকে দূর করেছ, তার জন্য কে দায়ী হবে বলো?"

নীলিমা নীরবে রহিল। দেবহূতি বলিয়া চলিল, "বাবা, কবীরের একটা দোঁহা প্রায়ই গাইতেন, শুনে শুনে আমিও শিখে ফেলেছি। সেই গানটার কথা আজ তোমায় বলছি—

'জীব মহলমেঁ শিব পহুনরা
কহাঁ কর ত উনমাদ রে।
পহুঁছা দেরা করিলে সেয়া
রৈন চলী আব তরী॥

জুগন জুগন করৈ পতীছন

সাহবকা দিল লাগা রে।

সুঝত নাহী পরম সুখ সোগর

বিনা প্রেম বৈরাগ রে॥

কহ্ত কবীর সুনো ভাই সাধো

পায়া অচল সোহাগ রে॥'

প্রিয়ধন যখন ঘরে পৌঁছেছে, তখন সেবা ক'রে নে, এমন সৌভাগ্য বহু প্রতীক্ষায় মিলেছে। না দিদি! তুমি আত্মবঞ্চনা ক'রে থেকো না।"

ভজুয়া আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়া বলিল, "মাইজী, বাবুলোক ফুলুরী চাইছেন।"

অন্য দিনের মত নীলিমা বলিল না, "যা, ঠাকুরকে ভাজতে বল গে।"

আজ নীলিমাই নিজে ফুলুরী ভাজিতে চলিল। তাহার মনের তারে আজ এক অবর্ণনীয় বেদনার সুর রহিয়া রহিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল।

১১

স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দে নীলিমা পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া উঠিল। নববধূর সরম-চকিত যে সমস্ত ভাবধারা অতীতের স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কয়েক দিন জোর করিয়া সে সেই হারাণো বসন্তের মধুস্মৃতি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

স্ত্রীর এই উন্মাদনাময় নবানুরাগ জিতেশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। রাত্রিতে ফুলের মালায় ফুলশয্যা করিয়া নীলিমা কখনও অবাক্ করিয়া

দেয়, কখনও পিছন হইতে পাঠনিরত স্বামীর চোখ দুইটি ধরিয়া থাকে। জিতেশ দুষ্টামী করিয়া বলে, "ভজুয়া ? কে, নরনাথ নাকি ?"

নীলিমা খিল খিল করিয়া হাসে। স্বামীর হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে, "পড়তে পাবে না।"

অকাল-বন্যায় কূল ভাসিয়া যায়। জিতেশ ভয়ে ভয়ে ভাবে, এ স্রোত স্থায়ী হইবে ত ? না অকস্মাৎ দমকা হাওয়ায় উজান ফিরিবে ?

ললিতা-দিদির ওখানে জলসা হইবে। অপূর্ব্ব বাঁশী বাজাইবে, মেখলা গান গাহিবে। বেলা, যূথিকা আরও অনেকের গান হইবে। পশ্চিমের এক জন কালোয়াৎ ধ্রুপদের খেলা দেখাইবে। নীলিমার আমন্ত্রণ হইয়াছে, তাহাকেও গাহিতে হইবে।

নীলিমা একখানা ছোট চিঠিতে ললিতা-দিদিকে জানাইল, নারী-সমিতির সম্পাদিকা সে আর থাকিতে পারিবে না। জলসায়ও সে যোগ দিতে যাইবে না। তাহার নানাপ্রকার অসুবিধা আছে।

অপূর্ব্ব আসিয়া জিতেশকে জানাইল যে, সব ঠিক, এমন সময়ে নীলিমা এমন করিলে তাহাদিগকে ভয়ানক লজ্জায় পড়িতে হইবে। জিতেশ বলিল, "যাও না, নীলি। এত দিন যত্ন ক'রে যাকে গ'ড়ে তুললে, আজ হঠাৎ তাকে এমন ভাবে বিসর্জ্জন করা কি ঠিক হবে ?"

নীলিমা বলিল, "না, তুমি আমায় পাঠিও না, তোমার কাছে তুমি আমায় বেঁধে রাখো।"

"এ কি পাগলামীর কথা তুমি বলছ ? নেহাৎ ছেড়ে দেবে, পরে দিও, আজ না গেলে ভাল দেখাবে না।"

সরল বিশ্বাসী জিতেশ নরনাথের কথা শুনিয়াও কিছু বুঝে না। পত্নীর

অনিচ্ছায়ও তাহার সন্দেহ জাগে না। যাহাদের মন উচ্চ চিন্তায় ভরপুর থাকে, তাহারা হয় ত জগতের কালো দিক্ দেখিতে পায় না।

নীলিমা বলি বলি করিয়াও অপূর্ব্বের কথা স্বামীকে বলিতে পারে নাই। আর বলিবার মত কিছুই ত ছিল না। অপূর্ব্বের বাহিরের আচরণে যে সুকুমার শালীনতা ছিল, তাহা তাহার অন্তরের দাহকে কখনও অশোভন করিয়া দেখায় নাই। কাযেই অভিযোগ করিবার কিছুই ছিল না। অপূর্ব্বের মনের জোরের যে মোহ ঐন্দ্রজালিকের বশীকরণের অপেক্ষা সম্মোহজনক, তাহা অনুভব করিবার, দেখাইবার বা বলিবার নহে।

নীলিমাকে কাযেই জলসায় যোগ দিতে হইল। জলসার আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাণারাম হইয়াছিল। কেবলমাত্র গীত-রসিক জনের মজলিস—গানের ফোয়ারায় যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গ গড়িয়া উঠিল।

অপূর্ব্বের বাঁশী আজ অপূর্ব্ব রসোন্মাদনায় বাজিতেছিল। গায়ক যেন অতীন্দ্রিয় জগতের স্পর্শ পাইয়া গাহিতেছিল, সে সুরে কি বেদনা, কি ব্যথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল!

পশ্চিমা কালোয়াৎ তৃপ্তি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া বাজনার তারিফ করিতে-ছিল, আর মাঝে মাঝে সুর ভাঁজিতেছিল, "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।"

বাঁশীর সুর সুর-সপ্তকের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কি দোল দিয়া ওঠা-নামা করিতেছিল! কত রাগ-রাগিণীর হাসি-কান্নার সুর-কম্পন মিশাইয়া অপূর্ব্ব কি যে বাজাইতেছিল, কে জানে? কিন্তু সুস্বর-লহরী সকলকে মুগ্ধ করিয়া যেন বেদনার্ত্ত করিয়া তুলিল।

নীলিমা বিমুগ্ধচিত্তে বাঁশী শুনিতেছিল। বাঁশী কি বলিতেছিল?—

"ওরে, আমার বুকে অমৃতরস উদ্বেল হয়ে উঠেছে—নির্ম্মল সুধায় ভরা সাগর—কূল নেই, কিনারা নেই! সজনি! তুই কি সেই পরমানন্দ-রস পান করবি না? আমার দিন কি দুঃখের জ্বালায় জ্বলবে? বিরহের অগ্নিতাপে কি কোমল নলিনীদল মূর্চ্ছা যাবে? ওগো দরদী, এস, তোমার জন্য সুরভিফুলে শয়ন পেতেছি, সুগন্ধি ব্যজন রেখেছি—ওগো মরমী, তুমি এস এস!—"

সকলেই বাহবা দিল। গীতরসিকগণ বলিলেন, "হাঁ, শিক্ষার মত শিক্ষা বটে!"

জলসা ভাঙ্গিয়া গেলে সকলেই যখন চলিয়া যায়, অপূর্ব্ব নীলিমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "আপনাকে আমার একটা কথা বলার ছিল, কিন্তু এত রাত্রে তার সময় হবে না, আমার কথা এই চিঠিতে লেখা আছে, দয়া ক'রে প'ড়ে দেখবেন।"

নীলিমা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। বলিবার মত জ্ঞান হয় ত তাহার তখন ছিল না। সে নীরবে হাত বাড়াইয়া দিল, অপূর্ব্ব তাহার হাতে সোনালী খামে এসেন্স-সুবাসিত একখানি ভারী চিঠি দিল। হাতে দিবার সময় ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, অপূর্ব্বের হাত নীলিমার হাতে লাগিয়া গেল।

সে হাত উত্তেজনার আবেগে কাঁপিতেছিল। নীলিমার বোধ হইল, যেন তাহার স্পর্শে সর্ব্বশরীরে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া গেল।

পথে আসিয়া নীলিমা দেখিল, তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। বিধাতার অনন্ত প্রেমের বার্ত্তা যেন জ্যোতিষ্কের অক্ষরগুলিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বনাথের দূত বোধ হয় তাহার প্রেমের দৌত্য জানাইতে পারিল না। নীলিমার মনে কেবল অপূর্ব্বের সেই যাদুকরী বাঁশীর সুর ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতেছিল।

কতবার মনে হইল, চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু ছিঁড়ি ছিঁড়ি করিয়াও ছিঁড়িতে পারিল না। বাহিরের জগতে বিশ্বপ্রকৃতি অক্ষয় ঐশ্বর্য্য-সম্ভার মেলিয়া বিশ্বজগৎ পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু নীলিমার অন্তরে তাহার সাড়া ক্ষণেকের জন্যও জাগিল কি? সে বিভ্রান্ত-মনে বাড়ী ফিরিল।

১১

নীলিমা ঘরে ফিরিতেই জিতেশ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন জলসা হলো?"

পরে আলোকে নীলিমার শুষ্ক ও বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কি! তোমার কি অসুখ করেছে, নীলি?"

নীলিমা শান্তস্বরে জানাইল, "না, তবে শরীরটা ভাল লাগছে না। যে মানুষের ভিড় ও গুমট, প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে।"

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া জিতেশ ক্লান্ত পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু নীলিমার কাছে আজ প্রণয়-নিবেদন ভাল লাগিল না। পত্নীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জিতেশ নিরস্ত হইল।

জিতেশ ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ক্লান্তিহরা নিদ্রা নীলিমার চোখে তাহার কুহকদণ্ড বুলাইতে পারিল না। অপূর্ব্বের দেওয়া চিঠি তখনও অপঠিত রহিয়া গিয়াছে। পত্রের মূক আবেদন থাকিয়া থাকিয়া যেন নীলিমাকে ডাকিতেছিল।

স্বামীকে নির্ভর-নিদ্রাযুক্ত দেখিয়া নীলিমা উঠিয়া পড়িল। স্বামীর শয়নকক্ষের বাহিরে যাইয়া বাতি জ্বালিয়া, সে অপূর্ব্বের চিঠি পড়িতে বসিল। সে লিপিকা নহে, সে যেন সাহিত্যিক রচনা। পড়িতে পড়িতে নীলিমার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল কেন?

"নীলিমা! আপনি ব'লে সম্বোধন ক'রে তোমায় দূর করতে চাই নে, তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম ধন হয়ে উঠেছ, তোমায় যে কোন্ ভাষায় ডাকবো, ভেবেই পাই না। আমার বই লেখায় যে কাল্পনিক প্রেমের ছবি আঁকি, তার বর্ণনায় রস আসে, ভাব আসে; কারণ, সেটা ফাঁকা আর যা বলতে যাচ্ছি, তা এত গভীর যে, ভাষাই হয় ত বিরূপ ক'রে তুলবে—

"আমি তোমায় ভালবাসি—অন্তরের সমস্ত তীব্রতা দিয়ে, যৌবনের কূলপ্লাবী সমস্ত আকুলতা দিয়ে, কবির সমস্ত কল্পনা ও মাধুর্য্য দিয়ে—

"তুমি চমকে উঠছ? শিউরে উঠছ কি? কিন্তু হে আমার কল্পলোকের মানসী! তুমি স্থির হয়ে ভেবে দেখবে, এতে অবাক্ হওয়ার কিছুই নেই।

"স্রষ্টা শিল্পীর স্পন্দমান হৃদয়ের অর্ঘ্যভার—তার যে অসীম ব্যাকুলতা, তুমি কি তা বুঝতে পারবে? তার মর্ম্ম জেনে সমাদর করবে?

"ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, কারণ, জগতে প্রেমই একমাত্র সত্য। তোমাদের স্বামী ও স্ত্রীতে প্রেম হয় নি, এ আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। প্রেমহীন ঐ হেয় জীবন যাপন ক'রে তুমি তোমার রসধারা শুকিয়ে ফেলবে? তোমার তৃষিত যৌবন-বসন্ত কি অকালে ফুরিয়ে যাবে? তোমার যে ক্ষুধিত আত্মা অজ্ঞাতে কেঁদে কেঁদে হয়রাণ হচ্ছে, তার খবর কি তুমি নেবে না?

তুমি ভাবছ—অন্যায় ও পাপ। অন্যায় ও পাপ মানুষের গড়া জিনিষ—মানুষ শিকল গ'ড়ে গ'ড়ে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে—মিথ্যা সংস্কার নিয়ে তুমি নিজেকে ভুলিয়ে রেখো না—

"সংসারে মানুষ প্রেমকে ভয় করে অথচ সাহিত্যে সে এই প্রেমের মাহাত্ম্যই গেয়েছে। তোমার শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনকাহিনী যতই মধুর হোক, লোকের চোখে সেটি অন্যায় সম্বন্ধ—অথচ এই নিয়ে ভারতবর্ষে কত যে ধর্ম্ম, কত যে সাহিত্য গ'ড়ে উঠছে, কে জানে ?

"চণ্ডীদাসের যুগের বড় ও ছোট সব মানুষকে মানুষ ভুলেছে। যে রামী রজকিনী চণ্ডীদাসকে ভালবেসেছিল, সেই ও তার প্রেম বেঁচে আছে—দান্তে বিয়াত্রিসের প্রেমে মসগুল ছিলেন, শেলী এমিলিয়া ভিবিয়ানীকে ভালবাসতেন---

"এই সব মহাপুরুষদের প্রেমকে কি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলবে ? তুমি ভাবছ, ভগবান্ এ প্রেমকে অভিশপ্ত করবেন-

"কিন্তু সত্যিই ভগবান্ নেই। ভীরু মানুষ তার আত্মরক্ষার উপায়ের জন্য একটা কল্পনাকে খাড়া ক'রে তুলেছে---আসলে ওটা একটা জুজু ! দয়ালু তোমাদের ভগবান্ যদি থাকতেন, তবে জগতে এত বৈষম্য কেন ? ভুয়ো কথায় তুমি শঙ্কিত হয়ো না—মানুষ তার বলের দ্বারাই জগৎ জয় করেছে—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হচ্ছেই হচ্ছে---

"আমিও অগাধ প্রেমের জোরে তোমায় ডাকছি---জানি, তুমি কিছুতেই আমায় দূর করতে পারবে না। কারণ, এও ফাঁকি নয়—কৃষ্ণের বাঁশীর মত আমার প্রেমের আহ্বান তুমি উপেক্ষা করতে পারবে না—তোমার অন্তর গেয়ে উঠছে--- বাতাসে তার সুর শুনছি---বলছে, এ প্রেমের কলঙ্কে

তুমি কলঙ্কী হবে—সোনা যখন আগুনে তাতে, তখন সে ভাবে, আমি পুড়েই মলাম, কিন্তু সে আগুন থেকে বেরিয়ে দেখে, আপন স্বরূপে অপূর্ব্ব কান্তি সে পেয়েছে। প্রেমের অগ্নিজ্বালা দেখে তুমি ডরিও না—

"সতীত্ব? বাজে কাহিনী—প্রেম কি কখনও খাঁচায় থাকে? সে যে খাঁচা ভেঙ্গে আকাশে ওঠে—দৈহিক যে পবিত্রতার তুমি জয়গান করছ—সে ত একটা সংস্কার বৈ ত নয়। কত জাতির মধ্যে দেখ, নারী দু'তিনবার বিয়ে করেছে—প্রতি নূতন পতির সহিত তাদের সম্বন্ধকে তারা সতীত্ব নাম দিয়ে বড়াই করছে—

"ন্যাকামি আমি দেখতে পারি না—মন অশান্ত হয়ে ব'লে ওঠে—আমায় ছেড়ে দাও, মুক্তি দাও, তখন দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নিয়েই কি তুমি সতী হয়ে রইবে?

"সে নয় নীলিমা। সংসারে খোলা কথা বল্লে লোকে চটে, অথচ অন্তরে তাকে ভজে। জগৎ খুঁজে বেড়াও, দেখবে, এক জন মানুষও সতী নয়; কারণ, মানুষ বৈচিত্র্যকে খুঁজছে—বাঁধন দিয়ে যখনই সে নিজেকে বেঁধেছে, হোক না সে সোনার বাঁধন, তখনই সে নিজেকে মৃত্যুর পথে দাঁড় করিয়েছে—

"আমি আমার বুক-ভরা প্রেমে তোমায় ডাকছি, তুমি কি আমায় উপেক্ষা করবে? প্রেমের যে নৈবেদ্য তোমার পায়ে ধরছি, তার সৌরভ জগৎকে জয়যুক্ত করবে, এ আমি অন্তর হ'তে বিশ্বাস করি।

"আমি জীবনে যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। কারণ, চাইতে জানলেই পাওয়া যায়। দ্রাক্ষার পেয়ালা দেখে যে কাতর, সে কখনও তার সুধার পরশ পায় না, যে জোর ক'রে কেড়ে নেয়, সেই ম'জে যায়। আমি তোমায়

চাই-ই চাই। তুমি হাসছ, ভাবছ তোমার নয় প্রেম আছে, আমি যে প্রেম দেই নি—

"তা হ'তেই পারে না! প্রেম পরশমণি; ওর ছোঁয়াচ লাগলেই প্রেম জাগবে—কম আর বেশী। তুমি আমার প্রেমে মজবে। কারণ, আমি জানি, যে জিততে চায়, সেই জেতে। জীবনে কখনও পরাজয় হয় নি—এবারও হবে না--

"পুষ্পমালা, ফুলের গুঞ্জন, কোকিল-কূজন দিয়ে তোমার চোখে ধূলা দিতে চাই না; অনাবৃত সত্য সবার চেয়ে ভয়ঙ্কর। তুমি আমায় ভালবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি—এই আমার বশীকরণ মন্ত্র। সে শুভদিনের রক্তরাগ সম্মুখে ঝলমল করছে, যে দিন তুমি প্রিয়তম ব'লে আমায় ডাকবে—

"আমায় নির্লজ্জ ও বেহায়া ব'লে গালি দিও না, কারণ, প্রেম লজ্জাকে মানে না।

"শুধু বার বার ক'রে বলতে চাই, আমার সকল কাটা ধন্য ক'রে যে গোলাপ ফুটবে, সে তুমি—সে তুমি—তোমায় আমার চাই-ই চাই। ইতি

তোমারই—অপূর্ব্ব"

নীলিমার হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ইজিচেয়ারে বসিয়া, বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলিকে একত্র করিয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার মন স্বস্তি পাইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, যেন ভূমিকম্পের কম্পনে পৃথিবী দুলিতেছে।

কতক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরিল। স্বামী অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন। বাতায়নে মেঘভাঙ্গা চাঁদের আলো আসিয়া জিতিশের সুপ্ত মুখমণ্ডলকে বিভাত করিয়া দিল। নীলিমা চাহিয়া দেখিল, কি অলোকসুন্দর রূপ, কি

সুনিবিড় তৃপ্তি। পরম প্রেমবান্ এই বিশ্বাসী স্বামীর সে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী? পরপুরুষ তাহার প্রেমে সন্দিহান হইয়া তাহার প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে? কি ক্ষোভের,—কি গ্লানির কথা! নীলিমার মনে হইল, সে মরিবে, কলুষ-ভরা জীবন আর রাখিবে না। কিন্তু বইপড়া মৃত্যুর একটা ঔষধও তাহার সঙ্গে নাই। গলায় দড়ি দিয়া মরিতে জানে না, আর অত সাহসও তাহার নাই।

বাহিরে পলের পর পল ত্রিযামা রাত্রি বহিয়া চলিয়াছে। নীলিমা তন্দ্রাহীন নয়নে তাহাদের গতি দেখিতে লাগিল; কখন বা তন্দ্রার আবেশে সে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। জিতেশ ঘুমঘোরেই বলিল, "ভয় পেয়েছ নীলি?" বলিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়িল। নীলিমা জাগিয়া আকাশের তারাপ্রহরীদের সতীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঘাতে যেন কাতর হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন দিবালোকের এই চিরসতর্ক চরগণ নীলিমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে, "ওরে ব্যভিচারিণি! সাবধান হ'!"

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ত্রস্ত জিতেশ জাগিয়া দেখিল, নীলিমা পাশে নাই। ভোরের মৃদু আলোয় পৃথিবী জাগিয়া উঠিতেছে; সে ব্যাকুলস্বরে ডাকিল, "নীলি! নীলি!"

স্নান করিয়া পূজারিণীর বেশে নীলিমা ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। জিতেশ সহাস্যে পত্নীকে কোলে টানিয়া বলিল, "বা, আজ যে এত ভক্তি?" পরে তাহার রুক্ষ ও পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নীলিমা, ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার?"

নীলিমা কথা বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে

লাগিল। জিতেশ অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কতক পরে থামিয়া বলিল, "আমায় তুমি বাঁচাও!"

"কি হয়েছে লক্ষ্মি! তোমার দুঃখ আমায় বলবে না, রাণু?"

নীলিমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমায় দূর ক'রে দাও, আমি তোমার যোগ্য নই।"

"বলছ কি তুমি, আজ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে কি?"

"বল! আমায় পায়ে ঠেলবে না ত, আমি বড় অপরাধিনী—"

বিস্ময়ে জিতেশ অবাক্ হইয়া রহিল। পরে সংযত হইয়া উত্তর দিল, "ভয় নেই, নীলিমা! যতই ছোট হও না কেন, তুমি যে আমার। সুখে-দুঃখে, শোকে তাপে, তোমার মহত্ত্বে ও নীচতায়, তোমার প্রেমে ও ঘৃণায় তুমি যে আমার অভিন্ন আত্মা।"

নীলিমা কথা বলিতে পারিল না; দেরাজ হইতে অপূর্ব্বের চিঠি বাহির করিয়া স্বামীর পায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

১২

পত্র পড়িয়া জিতেশ প্রথমে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। প্রথমে বিস্ময়, পরে ভয়, পরে সংশয় ক্রমান্বয়ে তাহার চিত্তকে মথিত করিয়া তুলিল।

সংসারের সহিত তাহার পরিচয় যথেষ্ট নহে। মানুষের কথা তাহার বই-পড়া বিদ্যার মাঝেই গুপ্ত, কেবল দুই চারি জন বন্ধুর সংস্পর্শে সে আসিয়াছে। তাহাদের জীবনের সমস্ত কথাও সে জানে না। তাহার

দৃষ্টি সংসারের ছোট কাহিনী এড়াইয়া কেবল বড় বড় তত্ত্ব লইয়া মস্গুল ছিল, সে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

কাব্য যাহারা লেখে বা পড়ে, তাহাদের মধ্যে নারীভাব জাগিয়া উঠে। স্ত্রীভাবে অভিরমিত না হইলে পুরুষ দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্রের মর্ম্ম জানিতে পারে না। এই অভাবের জন্যই ত জিতেশ সুখী প্রেমিক হইতে পারে নাই।

বিদুষী পত্নীর লাবণ্য-ললাম অঙ্গবৈভব তাহাকে কেবল মুগ্ধ করে নাই, পত্নীর চঞ্চল প্রাচুর্য্যের সৌন্দর্য্যরূপও তাহাকে বিহ্বল করিয়াছে। সেই পত্নী কি আজ তাহার নিকট হইতে মুক্তি চাহে? পত্নীর লীলাচঞ্চল ব্যক্তিত্বকে সে কখনও খারাপ চোখে দেখে নাই, পত্নীকে কেবল Muslin gil বলিয়া সে ভাবে নাই।

অপূর্ব্ব লিখিয়াছে, নীলিমাও তাহাকে ভালবাসে। এ কথা কি সত্য? কখনই নহে। এ অপূর্ব্বের ধাপ্পাবাজী। কিন্তু তবু সংশয় জাগিয়া উঠে। সংসারের পথ পিচ্ছিল, অপূর্ব্বের বাক্যের যাদু হয় ত নীলিমাকে ভুলাইয়াছে।

কয়েক দিন জিতেশ ছন্নমতি হইয়া বেড়াইল। স্বামীর মুখ দেখিয়া নীলিমা ভীত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, আপনার মনের কোণে কালিমা হয় ত লাগিয়াছে। কুমারী বয়সের শেখা নারায়ণ-পূজা লইয়া সে বসিল। নীলিমার ধর্ম্ম-প্রীতি জিতেশকে আরও ভাবিত করিয়া তুলিল, তাহার সন্দেহ একবার জাগে, এক বার নেভে। নীলিমার সরল আত্মনিবেদনের অর্থ জিতেশ বুঝিয়াও বুঝিল না।

পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নর-নারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইল। বন্ধুর নিকট সে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। হৃদয়ের বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা প্রতিবেদনে অনেক প্রশমিত হইল।

সব শুনিয়া নরনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "তুই একটা আস্ত রাস্কেল, তোর উপনিষদ্‌গুলি এবার না পোড়ালে চলবে না বলছি।"

বন্ধুর হাসির হল্লায় অপ্রতিভ হইয়া জিতেশ নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ভাই ?"

"ওরে বোকারাম! তুই যে ওথেলো হয়ে উঠলি। এক জন মানুষের সঙ্গে একত্র তিন দিন বাস ক'রে যদি তাকে তুই চিন্‌তে না পারিস্‌, তবে আর কার দোষ বল ত? আমি ত অল্প পরিচয়েই বলছি যে, বৌদি নিষ্পাপ ও শিউলিফুলের মত অকলঙ্ক ও পবিত্র।"

অনিশ্চিত সন্দেহের নাগপাশে জিতেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুর কাছে সমাধান পাইয়া সে আরাম অনুভব করিল। আশঙ্কার পশ্চাতে ছুটিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল. অন্ধকারে পথহারা পথিক ভোরের আলোকে যেন পথ পাইয়া বাঁচিল।

গভীর আত্মপ্রসাদে সে বলিল, "আমি তা হ'লে নেহাৎ বোকা ভাই, এ দু'দিন যে কি গভীর যাতনা ভোগ করেছি, নরক-যাতনাও বোধ হয় এর চেয়ে তীব্র নয়।"

"বোকা ব'লে বোকা, লেখার ধাঁচ দেখেও ত মানুষ চেনা যায়। বর্ণনার যে অপরূপ ভঙ্গিমা, এতেই বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা উভয়তঃ নয়। তবে ভগবান্ যা করেন, সব মঙ্গলের জন্য, এ গভীর আঘাত তোদের পাওয়া দরকার ছিল, নৈলে তোদের প্রেম পূর্ণতা লাভ করত না।"

জিতেশ খানিক অধোমুখে বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, "তা হ'লে ত ভাই আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে, অমূলক সন্দেহে ত তোর বৌদির প্রতি আমি ভয়ানক দুর্ব্যবহার করেছি।"

নরনাথ হাসিয়া কহিল, "যা হয়েছে. তার ত চারা নেই, তবে এখন গলবস্ত্রে যেয়ে বল্, 'শশিমুখি !

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং

ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্' ।"

দুঃখের মধ্যেও জিতেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পুনরায় নরনাথ বলিল, "সে যা হয় হবে, মানভঞ্জনের বহু মন্ত্র তোকে শিখিয়ে দিতে পারবো : কিন্তু ভাই, 'নায়ক-চূড়ামণিকে' রীতিমত শাস্তি দিতে না পারলে ত আর তার শিক্ষা হবে না।"

জিতেশ প্রসন্ন-চিত্তে কহিল, "না ভাই, যা হবার হয়েছে, বেচারীকে ক্ষমা কর। আমি না হয় চিঠি লিখে ওকে সহর ছেড়ে যেতে বলবো।"

নরনাথ বলিল, "ও সব দুর্ব্বলতায় রসের নাগর কি সায়েস্তা হবেন, প্রচণ্ড আলিঙ্গন দিলেই তার পরাণ শীতল হবে।"

"তা হ'লে কি করতে বলিস্ ?"

"এই রবিবারে ওকে চায়ের নিমন্ত্রণ কর। আমিও আসবো'খন, তার পর যা করবার, সে আমিই করবো, তার জন্য তোর ভাবনা নেই। আচ্ছা, আজ এখন তবে আসি।"

জিতেশ বলিল, "আর বৌদির সঙ্গে দেখা করবি নে ?"

"না, আজ থাক, তিনি নিশ্চয়ই লজ্জা পাবেন। সতীর কলঙ্ক-ভঞ্জন ক'রে তবে সতীর সাথে আলাপ করবো।"

মনের অজস্র আনন্দে জিতেশ পত্নীর সন্ধানে চলিল। বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া নীলিমা মেঘের খেলা দেখিতেছিল। মানুষের শত পরিবর্ত্তন হউক, প্রকৃতি তাহার রস-মাধুরী সর্ব্বদা বিকশিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জিতেশ আসিয়া ডাকিল, "নীলিমা !"

নীলিমা কথা কহিল না ; অধোমুখে বসিয়া রহিল। জিতেশ পত্নীকে সবল বাহুবন্ধনে পিষ্ট করিয়া বলিল, "আমার 'পরে রাগ করেছ, রাণি ?"

নীলিমার চোখ ফাটিয়া জল ছুটিল। মুক্তার মত অশ্রুদল তাহার রক্তিম গণ্ডে পড়িয়া রক্তারবিন্দে শিশিরদলের মত শোভা পাইতেছিল। জিতেশ সহর্ষে বলিল, "আমায় ক্ষমা করো, নীলি ! আমার প্রেম যে কূর্ম্মের মত আত্মগোপন ক'রে রয়েছে, প্রকাশ হয়ে অমঙ্গল ও অকল্যাণকে দূর করে নি, সে আমারই দোষ। হয় ত এ দুঃখের অভিঘাত আমাদের প্রয়োজন ছিল, দুঃখের বেশে এসেছে ব'লে আজ যেন একে অবজ্ঞা না করি।"

নীলিমা কথা কহিল না। আনন্দাতিশয্যে স্বামীর বুকে সে এলাইয়া পড়িল।

১৩

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "এ কথা ঠিক নরনাথ বাবু, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পায়ে আমরা মানুষের আত্মাকে বলি দিচ্ছি।"

"তা না দিয়ে উপায় কি ? মানুষের মন স্বার্থমুখী হলেই তা অসংযত ও অরূপ হবেই।"

"না, ঐটে আপনার ভুল। জিতেশ বাবু, আপনি ত উপনিষদ পড়েন, কোন্ উপনিষদে আছে না যে, বিত্ত, প্রিয়া, পরিজন, ব্রাহ্মণ, দেবতা আত্মার প্রীতির জন্যই প্রয়োজন ? আত্মার প্রেয় বলিয়াই তাহাদের প্রয়োজন ?"

জিতেশ বলিল, "হাঁ, বৃহদারণ্যক এ কথা বলেছেন।"

"তবেই দেখুন, আত্মবিকাশের পথরোধ করায় আত্মহত্যা।"

নরনাথ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে কি আপনি চান যে, আত্মবিকাশের নামে মানুষ স্বৈরাচার করবে?"

অপূর্ব্ব বলিল, "ঐ ব্যবস্থাই নিয়ে ত গণ্ডগোল। আজ আপনি যাকে স্বৈরাচার বলছেন, কাল মানুষ তাকে ন্যায্য বলবে। বেদের যুগে গার্গী ব্রহ্মবিদ্যা জানালেন, আর পুরাণের যুগে নারী বেদ পড়লে পাতকী হলেন, এই ত আপনার মানুষের বিচার।"

"তা হ'লে কি আপনি বলতে চান যে, সংসারে যার যাহা খুসী করুক্, তাই চলবে?"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল, "চালাতে জান্‌লেই চলবে।"

খানিক পরে নরনাথ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "দেখুন, আপনার লেখা প'ড়ে আমি বুঝতে পারি না। বাঙ্গালা দেশের মানুষ, বাঙ্গালা ভাষা এত দিন ধ'রে পড়ছি, কিন্তু না পারি বুঝতে আপনাদের নূতন লেখার ইডিয়াম, না পারি ধরতে তার পদবিন্যাস-পদ্ধতি।"

"ওর জন্য দুঃখ ক'রে কি করবেন বলুন। প্রতিভা ফরমায়েসী জিনিষ গড়ে না, স্রষ্টার সৃষ্টি যেরূপ অচিন্তনীয়, তার প্রকাশও তেমনি অদৃষ্টপূর্ব্ব।"

নরনাথ পুনরায় বলিল, "বেশ, আপনি নারীর সতীত্বকে যে এত তুচ্ছ ক'রে তুলেছেন, সতী নারীর সঙ্গ কি জীবনে আপনার হয়েছে?"

"হোক্ আর না হোক্, কবির কল্পনা নিরঙ্কুশ। আমি আমার চিন্তায় সাধনায় যা বুঝেছি, তাই প্রচার করেছি। আমার মনে হয়েছে, মানুষের দেহের শুচিতা ও পবিত্রতা থাকলেই সে শুচী হয় না, রসের ও

রূপের আহ্বান মানুষকে পলে পলে বুভুক্ষু ক'রে তুলে, কাযেই মানুষ জোর ক'রে আত্মনিপীড়ন করে ছাড়া সতীত্বপণা করতে পারে না।"

"এটা আপনার ভয়ানক ভুল ধারণা, অপূর্ব্ব বাবু। আপনি যে বিচার করেছেন, তা আপনার অন্তর দিয়ে। একনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখ প্রেম নারীর বিশেষত্ব; বহুগামিতা ও লালসার উগ্রজ্বালা পুরুষেরই বেশী, এ কথা কেবল আমার কথা নয়, বড় বড় যৌনতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরাও বলেছেন। পুরুষ Polygamy চায়, আর নারী monogamy চায়।"

অপূর্ব্ব নরনাথের যুক্তিমধুর কথায় বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। সে আত্ম-রক্ষার জন্য সাধারণ যুক্তির সহায়তা না লইয়া বিশেষ দৃষ্টান্তের ও ব্যক্তিত্বের জোরে নরনাথকে দাবাইতে চাহিল—"ও কথা মোটেই ঠিক নয়। কি নর, কি নারী, উভয়েই বাঞ্ছিতকে পাওয়ার জন্য উদগ্র হয়ে উঠে। নারীর মধ্যে বহুচারিণী ভাব সুপ্ত, কারণ, পদে পদে সমাজ তার বাধা-শৃঙ্খল রচনা করেছে। অন্নবস্ত্রের বদলে নারীর আত্মাকে তারা তিলে তিলে চূর্ণ করেছে, কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতির আবেদন কি কত রূপে, কত রসে, কত গন্ধে, কত স্পর্শে, কত শব্দে প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে না? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বলেছেন, রাবণের যদি শক্তি থাকতো, তবে সীতার মত সতীও সতীত্ব রাবণের পায়ে ঢেলে দিত। কথা হচ্ছে, শক্তি চাই; শক্তি থাকলে, সমস্ত নারীই পায়ে লুটিয়ে পড়ে—"

অপূর্ব্বের কথায় নরনাথের ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্রোধ সংবরণ করিতে শেখে নাই, জীবনে শক্তিকেই সে সত্যের বাহন বলিয়া মনে করে। তাই সহসা এক অবাক্ কাণ্ড করিয়া ফেলিল। নরনাথ সবেগে অপূর্ব্বের মুখে এক ঘুসি লাগাইল, আর জোরে জোরে বলিল, "বেকুফ, এ কথা বলতে

তোর জিভ খ'সে পড়লো না? আমি ভেবেছিলুম, তোর মধ্যে হয় ত কিছু শক্তি আছে; কিন্তু দেখছি, একেবারে গোবর—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অপূর্ব্ব সেই প্রবল ধাক্কায় মাটীতে গড়াইয়া পড়িল, নাক দিয়া ঝর-ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, চেয়ার উল্‌টিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িল, চোখের Tortoise shell চশমা শতধা চূর্ণ হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "Scoundrel!" চেয়ার-পতনের শব্দ আর নরনাথের গলাবাজি শুনিয়া নীলিমা ও দেবহূতি ছুটিয়া আসিল।

জিতেশ অপূর্ব্বকে অপমানিত দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নরনাথ যে এক জন ভদ্রলোককে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া ঘুসি মারিবে, এ কথা সে কিছুতেই ভাবিতে পারে নাই। স্নেহশীল তাহার চিত্ত অনুশোচনায় অপূর্ব্বের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া উঠিল। সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "না ভাই, ওকে ছেড়ে দে, পৃথিবীতে কে নিষ্পাপ? পাপী হয়ে পাপের শাস্তি দেওয়ার ভার নেওয়া ঠিক নয়, ভাই!"

নরনাথ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "নরাধম, পাষণ্ড! ওর শাস্তির হয়েছে কি? ভদ্রমহিলাকে যারা অপমান করতে পারে, তাদের জীয়ন্তে গোর দেওয়া উচিত।"

অপূর্ব্ব নেতাইয়া পড়িয়াছিল। খানিক পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "জিতেশ বাবু, এ কি ভদ্রতা আপনার? ভদ্রলোককে বাড়ীর 'পরে ডেকে এনে অপমান, এ আপনাদের কোন্ দেশী ভদ্রতা?"

জিতেশ লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া রহিল। নরনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "চুপ কর্, নরপিশাচ! আপরাধ করেও যে তোর বড় গলা রয়েছে; সহজ শিক্ষায় হবে না দেখ্ছি।"

এই বলিয়া পকেট হইতে অপূর্ব্বের লেখা লেফাফাখানা খুলি শয়ান অপূর্ব্বের সম্মুখে ফেলিয়া বলিল, "এখন বল্, পাজি, কি জবাবদিহি তোর আছে ?"

সম্মুখে উদ্যতফণ সর্প দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, লেফাফা-খানি দেখিয়া অপূর্ব্ব তেমনই অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া কাতর-নয়নে নীলিমার মুখের দিকে চাহিল।

নীলিমার মুখ লজ্জায় ও শঙ্কায় সাদা হইয়া উঠিল। বিচারকের সম্মুখে, উৎসুক জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরাধী যেমন ভয়ে ও আতঙ্কে কাঁপিতে থাকে, নীলিমাও তেমনই লতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

গৃহের সমস্ত প্রাণী যেন এক অভিনয় দেখিতে স্তব্ধ হইয়াছিল। নরনাথ বলদৃপ্ত-স্বরে প্রশ্ন করিল, "বল্ কুলাঙ্গার, যে কুললক্ষ্মীর অপমান তুই করে-ছিস, তিনি নিষ্পাপ—"

অপূর্ব্ব অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। সে যে কি করিবে, কি বলিবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না! নরনাথ ব্যাঘ্রের মত অপূ-র্ব্বের উপর পড়িয়া তাহার ঘাড়ের ঝুঁটি সজোরে ধরিয়া বলিল, "তবে রে সয়তান! এখনও সয়তানী? বল, এখনও সত্যি কথা বল্—"

সেই সবল করস্পর্শ প্রেমের রোমাঞ্চকর অঙ্গস্পর্শ বলিয়া ভুল করিবার হেতু ছিল না। হতবুদ্ধি অপূর্ব্ব আত্মরক্ষার যে আদিমতম সংস্কার জীবে রহিয়াছে, তাহারই প্রভাবে বুদ্ধি ফিরিয়া পাইল। তাহার পর করুণ-কণ্ঠে

বলিল, "উনি দেবপূজার নির্ম্মাল্যের মতন শুচি ও নিষ্পাপ, আমিই অপরাধী—"

নীলিমার গণ্ডে রক্ত-লোহিত ঝলক দিয়া গেল। জিতেশ একান্তপ্রাণে ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাইল। অবিশ্বাসের কত্তিত যে ভগ্নমূল তাহার মনের কোণে গোপন আড়াল দিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাহার অন্তরও শুদ্ধ ও পুলকিত হইয়া উঠিল। নরনাথ তবু বে-পরোয়া। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই তাহার ব্যবসা। কাযেই শাস্তির উপকারিতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস। নরনাথ উগ্রস্বরে বলিল, "তবে বাছা! ছিনালীপনার শাস্তি নিতে হবে। যাও, এখান থেকে নাকে খত দিয়া বৌদির পা পর্য্যন্ত যাও, তার পর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বল—'মা! আমায় ক্ষমা করো'।"

তৃপ্ত-চিত্তে জিতেশ বলিল, "আর কেন, ভাই! যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।"

নরনাথ বন্ধুর কথায় কর্ণপাত করিল না; অটল ও অবিচল আত্ম-বিশ্বাসে শুধু বলিল, "যে সব হতভাগারা এমন চিঠি লিখে কুলবধূর অপ-মান করতে পারে, সীতার মত সতীরাণীর চরিত্রে এমন দুষ্কলঙ্ক দিতে পারে, তাদের ফাঁসী দিলেও উচিত শাস্তি হয় না—তাদের জন্য প্রাচীন বর্ব্বরপ্রথায় শাস্তি বিধেয়।"

দেবহূতি নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে-ও করুণার্দ্রচিত্তে বলিল, "থাক্, আর বাড়াবাড়ি করো না।"

কিন্তু নরনাথ দৃঢ়। বাধ্য হইয়া অপূর্ব্বকে নরনাথের কথামত নাকে খত দিয়া সমস্ত বলিতে হইল। বেচারীর নাকের রক্ত পুনরায় পড়িতে লাগিল।

নীলিমা সদয়-কণ্ঠে বলিল, “ভাই, ভগবানের কাছে আশীর্ব্বাদ কামনা করি, তোমার সুমতি হোক্। বাঙ্গালা দেশ তোমাদের কাছে অনেক আশা করে, কিন্তু এমন মনোবৃত্তি আর দেখিও না।”

জিতেশও স্নেহ-মধুর স্বরে বলিল, “অপূর্ব্ব বাবু, লালসা কখনও কল্যাণ-সুন্দর হ'তে পারে না। যে প্রেম মানুষকে মহীয়ান্ ক'রে তুলে, সেই প্রেমায়ন রচনা করুন, কামায়নের অগ্নিজ্বালায় লোককে আর ভুলাবেন না।”

অপূর্ব্ব কথা কহিল না। বিপাকে পড়িয়া যে দুর্ভোগ তাহাকে সহ্য করিতে হইল, কল্পনায় কোন দিনই তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। মনের মধ্যে যে সব তর্ক জটলা করিতেছিল, বর্ত্তমানে তাহা বলিয়া অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করা সমীচীন মনে হইল না।

দুঃখে ও অভিমানে, ক্রোধে ও দ্বেষে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। কিন্তু স্থান ও কাল বাদী, গৃহের অনুভবনীয় মৌনতায় যে আরও বিকল হইয়া পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে চশমার ফ্রেমটি কুড়াইয়া লইয়া, নীলিমার দিকে ম্লান বিষণ্ণ ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি ফেলিয়া পাশের দরজা দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে বহুক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না। নরনাথও চেয়ারে নীরবে বসিয়া নিজের কৃত কর্ম্মের যৌক্তিকতার আলোচনা করিতেছিল। চিন্তা-ভারকে দূর করিবার জন্য সে জোর করিয়া হাসিল, তার পর বলিল, “সব চেয়ে দুঃখ ভাই, ওর রসবোধের একান্ত অভাব। হা! হা! হা!” কিন্তু নরনাথের উচ্চহাস্যে তখন কেহ যোগ দিতে পারিল না। ব্যাপারটির আকস্মিকতায় ও অদ্ভুত পরিসমাপ্তিতে সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

১৪

এক মাস পরের কথা। ভাদ্রের ভরা-প্লাবনে নদী কূলে কূলে বিপুল জলোচ্ছ্বাসে প্রণয় নিবেদন করিয়া যায়। ঘাটে মাঠে ধানের পাতায় পূর্ণতার গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে।

ঘেরা-টোপ বারান্দায় ইজিচেয়ারে মেঘদূত হাতে লইয়া জিতেশ বসিয়াছিল। নীলিমা বসিয়া অর্গানে সুর ভাঁজিতেছিল।

এই দম্পতির জীবনে একটি মহা বিবর্ত্তন আসিয়াছে।

জিতেশ তাহার উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী আলমারিতে ভরিয়া গীতাঞ্জলি ও মেঘদূত লইয়া মসগুল হইয়াছে। নীলিমা তাহার সমান অধিকারের বক্তৃতা ভুলিয়া সেবায় ও আদরে পতিকে একবারে আপন করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অপ্রাপ্য যখন ঘরে আসে, মানুষ জানে না, কেমন করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিবে, কেমন করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবে। জিতেশ যৌবনের যে আশাবেদনা-উচ্ছল দিনগুলিকে পুথির পাতায় ঢাকিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিতেছিল, তাহারা প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইল।

নীলিমা আজ তাহার সকল স্বপ্ন, সকল ধ্যান, সকল জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে। ভোগবাসনাকে শুধু দর্পে প্রতিহত করিলেই ত সে মরিয়া যায় না, আঘাত-বেদনায় সে বরং চারিদিকে বিষ-বাষ্প ছড়াইয়া দেয়। শাস্ত্র হয় ত তাই ভোগের দ্বারাই ত্যাগ করিতে বলিয়াছে।

নবোপলব্ধ আপনার তরুণ মনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। পত্নীর জন্য ৯ শত টাকা ব্যয় করিয়া সে একটি ভাল অর্গান কিনিয়াছে, তাহাতে এমন করিয়া আয়না ও নীলিমার

ফটো বসানো যে, যে দিক্ হইতে দৃষ্টিপাত করা যাইবে, নীলিমার হাসিমুখ দেখিতে পাওয়া যাইবেই।

নরনাথ মাঝে মাঝে আসিয়া বলে, "দাদা, সুখের দিনে মিলন-দূতকে যে একেবারে ভুলেছ।"

জিতেশ ও নীলিমা মধুর হাসি হাসিয়া তাহার উত্তর দেয়।

পতির দিকে চাহিয়া নীলিমা বলিল, "তুমি পড়বে, না আমি গান গাইবো ?"

"গানের কাছে কি কবিতা ? তুমি গাও, রাণি !"

"অমন করলে বলছি, গাইব না।"

"তাই না কি, তবে গলায় কাপড় দিয়ে বলছি, 'এ ধনি মানিনি ! মান নিবার'।"

নীলিমা কথা কহিল না, অর্গানের সুর চড়াইল। বাদ্যযন্ত্রটি যেমন সুন্দর, নীলিমার গলাও তেমন মধুর। নীলিমার গান যেন জগৎ প্লাবিয়া দ্যুলোকে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর সেখান হইতে পারিজাত-সৌরভ আনিয়া মর্ত্ত্যকে ত্রিদিব করিয়া তুলিতেছিল।

নীলিমা গাহিতেছিল—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।
নিধন বলিয়া পিয়া না কলুঁ যতন
এবে হাম জানল পিয়া বড় ধন।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি
নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি।"

গাহিতে গাহিতে নীলিমা ভাব-বিভোর হইয়া পড়িল, কবির বাণী যেন তাহারই অন্তরের বাণী হইয়া বিশ্বকে আর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

হঠাৎ নীলিমা দেখিল, জিতেশ মেঘদূত খুলিয়া কি পড়িতেছে। গান থামাইয়া বলিল, "বা! এই বুঝি তোমার গান শোনা? যাও,—আর যদি কখনও গান গাই।"

জিতেশ সহাস্যে বলিল, "'মুঞ্চ মানং মানময়ি রাধে'। দিব্যি করলে, কিন্তু পরে পস্তাতে হবে। তোমার গানের সাথে সাথে কালিদাসের একটা শ্লোক মনে প'ড়ে গেল, আজ মাহ ভাদরে—ভরা বাদরে কালিদাসের সেই গীতিকা আমায় উন্মনা ক'রে তুলেছে।"

নীলিমা বলিল, "শ্লোকটি কি, প'ড়ে শুনাও না।"

জিতেশ বলিল, "বাঙ্গালা অনুবাদ ক'রে তোমায় শোনাচ্ছি, শোন—

'প্রণয়িনীর কণ্ঠ কোমল জড়ায়ে ধ'রে বুকে
বাদল-ঝরা মেঘের দিনে না জানি কোন্ সুখে
প্রিয় যে জন সুখে মগন উদাসী চিতে চায়,
প্রিয়-হারা বিরহী জন কত না দুঃখী হায়'।"

নীলিমা স্বামীর কবিতা শুনিবার জন্য স্বামীর নিকট আসিয়াছিল, স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া স্বামীর ভাবমধুর মুখের পানে বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কার কথা মনে পড়ছে ?"

জিতেশ কৌতূহলভরে বলিল, "জানি না।" তাহার পর পত্নীর রক্তপদ্মললাম ওষ্ঠপুট আদরে ভরিয়া দিয়া প্রসারিত ভূজদ্বয়ের মধ্যে পত্নীকে টানিয়া লইল। নীলিমার নিকট বাক্যের প্রয়োজন ছিল না, তাহার সমস্ত অন্তর যেন মধুরতায় আদ্র হইয়া উঠিল।

বাহিরে বিপুলা পৃথ্বী তাহার বিপুল গতিবেগে স্পন্দিত হইতেছে। নিরবধিকাল পলে পলে নূতনকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শুধু মুগ্ধ দম্পতির অন্তরে পরিপূর্ণতার সুনিবিড় শান্তি সমস্ত কোলাহল থামাইয়া নূতন এক প্রেমময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে।

আলো-ছায়া

১

সারা গগনে কালো মেঘ জমিয়াছে, শীতল বাতাস থাকিয়া থাকিয়া মৃদুভাবে বহিতেছে। বৃষ্টি নামে নি, তবে আসন্ন বর্ষার উদাস রাগিণী যেন কাণে একটু একটু আসিতেছিল, আমরা তখন মজলিস-ঘরে বসিয়াছিলাম। সান্ধ্য চায়ের ধোঁয়া উড়িতেছিল, তাহাতে যেন একটু নেশা আসিতেছিল। তখন সমর বলিয়া উঠিল, "না, আজ আর খেলা জমবে না, এস গল্প করা যাক।"

অমরেশ উত্তর করিল—"গল্পই বা কোথায় পাবে, কাগজগুলো ত সব পড়া শেষ হয়ে গেছে। বাসি গল্প ত আর ভাল লাগবে না।"

আলো-ছায়া

নীপেশ গম্ভীরমুখে বসিয়াছিল, বাইরের কালো মেঘের ছায়া যেন তার মুখে মাখিয়া গিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "কি হে, আজ যে এমন গুরুগম্ভীর ?"

তার উত্তরে নীপেশ একটি করুণ নিশ্বাস ছাড়িল ও বলিল—"তোরা গল্প শুনতে চাইছিস, তবে শোন, আমার জীবনের একটি করুণ কাহিনী তোদের শুনিয়ে দিই। গল্প নয়, এটা প্রাণের রাঙা রক্তে তাজা।"

নীপেশ আমাদের দলের মধ্যে সবার চেয়ে সরল, সবার চেয়ে চপল। তার প্রাণে যে লুকানো কোন বেদনা আছে, তাহা আমরা জানিতাম না।

হেনা-ফুলের মদির গন্ধ বাতাসে ঠেলিয়া আনিতেছিল। সেই হেনার বাসের মত মাতোয়ারা স্বরে নীপেশ বলিতে লাগিল—"আমার ছন্নছাড়া জীবনটা উদ্দাম কৌতুককে সঙ্গী ক'রে নিয়েছে। তাই তোরা, ভিতরে যে আগ্নেয়গিরি লুক্কায়িত আছে, তার খবর রাখিস নে। সেবার আমি বি-এ পাশ ক'রে বেরিয়ে পড়লাম,—দেশটাকে একবার নিজের চক্ষে দেখতে। সহরে অনেক সময়ে বাস করলেও, আমার মনে পল্লীর প্রতি একটা গোপন টান, একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণই বোধ হয় আমাকে ঘরের বাহির করেছিল। শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালার স্বর্ণশ্রী আজিও লোপ হয় নি। উন্মুক্ত আকাশতলে অবারিত মাঠ-ঘাট প'ড়ে রয়েছে। অজস্র বনজ তরুলতা সবুজ বসনের মতন পল্লী-মায়ের সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে। বন্য পুষ্পসম্ভার পল্লী-পথকে সুগন্ধে মাতায়ে রেখেছে। স্ফটিক-শুভ্র তোয়ধারা নদীর বুক ভাসায়ে বয়ে যাচ্ছে। আর এই শোভাসম্পৎ—এই মাধুরী—এই ঐশ্বর্য্য অজ্ঞাতসারে উপভোগ ক'রে পল্লীবাসীরা সেই সনাতন সরল জীবন যাপন করছে। আমি যেখানেই

যেতাম, সেখানেই মধুর আতিথ্য আমাকে মুগ্ধ করত। পল্লীতে পল্লীতে 'জামাই আদর' পেয়ে আমার মনটা বড়ই সুখী হচ্ছিল। এই সুখ আমাকে একটা উচ্চ ভাব, একটা সতেজ আগ্রহ, একটি তীব্র উন্মাদনা আনিয়ে দিয়েছিল। তাই আমি পল্লীতে পল্লীতে বর্ত্তমান জগতের বিশ্ব-প্রেমের বাণী, মুক্তির আহ্বান, মনুষ্যত্বের সাধনা, যুগসন্ধির কর্ত্তব্য প্রভৃতি উচ্চতম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতাম। পল্লীবাসিগণ আমার মহাভাব-গুলি বুঝত, শুনত ও মনের মাঝে অনুভব করতে চেষ্টা করত, ইহা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই স্থানে স্থানে দু'দশদিন থেকে যুবকগণকে মাতায়ে সেবাশ্রম, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি খুললাম। কতক-গুলি বিষয়ে আমার মতের সহিত তাহাদের মত মিলত না। জাতিভেদের নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিক হীনতা তাহারা উদাসীনভাবে মেনে নিত। গ্রামে গ্রামে, জাতিতে জাতিতে হিংসাভাব কমতে লাগল বটে, কিন্তু অতীতের এই জীর্ণ কঙ্কাল চূর্ণ ক'রে যে বিরাট সাম্য গড়তে চেয়ে-ছিলাম, তা হ'লনা। এইরূপে মাস ছয় কেটে গেল। আশা ও আনন্দে এবং সাফল্যের উৎসাহ আমাকে মাতায়ে রেখেছিল, তাই কোথা দিয়ে যে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তা বুঝতে পারি নি। অব-শেষে মায়ের চিঠি পেয়ে বাড়ী ফিরতে সংকল্প করলাম।"

এই সময় নীপেশ একটু থামিল। সমর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"এই তোর গল্প; সন্ধ্যেটাই মাটী করলি দেখছি। এ যে মস্ত বড় একটা বক্তৃতা দেখছি।"

"অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, 'সবুরে মেওয়া ফলে' এ প্রবাদবাক্যটা ত জানিস।" এই কথায় আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম।

২

হাসি থামিতেই নীপেশ বলিতে লাগিল ;—তখন মনসাপুরে ছিলাম। সেখান থেকে শক্তিগড় ষ্টেশন মাইল চার। বেলাশেষে যাত্রা সুরু করলাম। দুই মাইল যেতে না যেতে আকাশ কালবৈশাখীর মেঘে কালিমাময় হয়ে গেল। ঈশান কোণ হ'তে প্রবল ঝড় উঠল। এ দিকে সন্ধ্যার তিমিরচ্ছায়াও নিবিড় হয়ে নেমে আসল। সেই অন্ধকারে ও ঝড়ে পথ চলা অতি কষ্টকর মনে ক'রে একটি আশ্রয়স্থান খুঁজতে লাগলাম। আমার পথ প্রান্তরবিলম্বী, পাশে ঘনতরুচ্ছায়ার ঘেরা একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল—সেই দিকেই দৌড়ালাম। চলতে চলতে ঝড় তীব্র হয়ে আসল। ধূলা উড়ে চক্ষুতে লাগতে লাগল। অতিকষ্টে একটি দালানের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। দালানের দরজা বন্ধ, তবে একটা ভাঙ্গা জানালার ফাঁকে ভিতর হইতে সন্ধ্যা-দীপের ক্ষীণ আলো আসছিল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। তখন ভিজা বিড়ালের ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে দরজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ডাক-লাম—"ওগো, ঘরে কে আছ ? দরজা খোল।" আমার কথা বোধ হয় বাতাসে উড়ে গেল। পুনরায় ডাকলাম, কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তখন জানালার ধারে মুখ দিয়া জোরে ডাকলাম। কিছু পরে পদসঞ্চা-লনের শব্দ শুনলাম। তার পর দরজা খুলে একটি সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী প্রদীপ আঁচলে ঢেকে দরজা খুলল ও বীণানিন্দিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল —"কে ?" সেই প্রকৃতির বিপ্লবময়ী রুদ্রমূর্ত্তির পাশে এ কি কোমলতা এসে দাঁড়াল ! প্রদীপের ক্ষীণ আলো বাতাসে কাঁপছিল, আধ-আলো

আধ-ছায়ায় অপরিচিতা আলো-ছায়ার মতই মহিমামণ্ডিত হয়ে দাঁড়াল। সহসা বিদ্যুৎ চমকিল, সেই ভাস্বর আলোকে তরুণীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ডালিম-রঙের গণ্ড, নয়ন যেন ভারাক্রান্ত। বিদ্যুৎ-চমকে এক জন অপরিচিত যুবককে সম্মুখে দেখে তরুণীর অরুণ মুখমণ্ডল আরও অরুণাভ হ'ল। সেই স্তিমিত বিস্ময় দমন ক'রে সে বলল, "ঘরের ভিতর আসুন।"

ঘরের ভিতর ঢুকলাম। অপরিচিতা আমাকে লয়ে একটি অনতি-প্রশস্ত ঘরে বসতে বলল। সেখানে নিম্নে ভূশয়নে একটি বৃদ্ধা শুয়ে-ছিলেন। অনুমানে তাঁহাকে পীড়িতা ব'লে মনে করলাম। প্রদীপের আলোকে সেই তরুণীর পানে একবার চেয়ে দেখলাম। বালিকা অনূঢ়া—যৌবন তাহার পূর্ণতায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করেছিল। হিন্দু ঘরের এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে, তাহার সহিত আলাপ করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগল। কিন্তু অবস্থাগতিকে কথা না বললেও চলে না। কারণ, গৃহে অন্য জনপ্রাণী কাহাকেও দেখলাম না। তাই বাধ-বাধ স্বরে কুণ্ঠিতচিত্তে বললাম—"আপনাকে বড় অসুবিধায় ফেললাম, দেখছি।"

তরুণী লাজনম্র স্বরে কহিল,—"অসুবিধা বিশেষ কি, তবে আমার মা মরণাপন্ন, আপনাকে যত্ন অভ্যর্থনা দূরে থাকুক, একটু ক্ষণিক আরাম হয় ত দিতে পারব না।"

শরৎশিশির-ভেজা দূর্ব্বার মত সজল নয়নপল্লব দুটি ব্যথায় আনত হয়ে উঠছিল। তরুণীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে বৃদ্ধা যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করলেন, কাযেই তাঁর সেবার জন্য তরুণী রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে

গেল। এ দিকে ঘনঘটা আরও জেঁকে বসল। বর্ষার প্রকৃতি দেখে বোধ হ'ল যে, বাহির হবার আর জো নাই। তখন কি করব, বুঝে পেলাম না। একলা অনূঢ়া কিশোরী, আর রুগ্না মাতা মৃত্যুর তীর-শায়িতা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললাম, "দেখুন, ভদ্রতা আমাকে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব আমায় থাকতে বলছে। এই দুর্য্যোগ আর আপনি একা, আপনাকে ফেলে যেতে আমার মন সরছে না। আমার প্রগল্ভতা ক্ষমা করবেন বোধ হয়।"

বৃদ্ধাকে ধীরে ধীরে বাতাস করতে করতে তরুণী উত্তর করল—"না, আপনি সঙ্কোচ অনুভব করবেন না, আমরা একা, সংসারে বড় একা—বাইরে আমাকে মিশতে হয় ; আর সমাজ, তাকে আমি ভয় করি নে।"

এ কি কথা শুনছি। যেন চলতে চলতে উদ্যত সর্পের ফণার সম্মুখে পড়লাম। সমাজকে ভয় করে না, না জানি কত তীব্র নির্য্যাতনে। বৃদ্ধার ক্ষয়কাসি ; কাসতে কাসতে তাঁহার প্রাণান্ত হচ্ছিল, শরীর কৃশ ও ক্ষীণ হয়ে যেন বিছানায় মিশে গেছে। তদুপরি বোধ হ'ল যেন, বহুদিন বৃদ্ধার রীতিমত আহারাদি হয় নাই। বৃদ্ধার কাসির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তরুণী আর কথা কহিল না ; তাঁহার শুশ্রূষায় রত হ'ল। আর আমি ব'সে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম। বাইরে বর্ষণ সমভাবেই চলতে লাগল।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার যন্ত্রণা যেন বাড়তে লাগল। আমি আর থাকতে না পেরে বল্লাম, "দেখুন, আমি আপনার মায়ের পাশে বসি, আপনার মায়ের কষ্ট লাঘব না হ'ক—আপনার অন্ততঃ—"

যুবতী না জানি কেন আমাকে বাধা না দিয়া বলিল—"আজ্ঞে, তবে

একটু দয়া ক'রে বসুন।" এই বলিয়া তরুণী চ'লে গেল। মুহ্যমান বৃদ্ধা এতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, সহসা তিনি যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'লেন ও ক্ষীণস্বরে ডাকলেন—"মা, নীলিমা!"

"ডাকছেন কেন তাকে?"

"কে তুমি বাবা?"

"আজ্ঞে, আমার নাম নীপেশ,—জলঝড়ে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পরে করুণস্বরে বলতে লাগলেন, "বাবা! অনেক দিন মানুষের মুখ দেখি নি, তোমায় দেখে বড় সুখী হলুম বাবা, সুখে থাক, রাজরাজেশ্বর হও।"

থেমে আবার বলতে লাগলেন—"মৃত্যু আমার ঘনিয়ে এসেছে, মরণের বাজনা বেজে উঠেছে, মরলে সকল দুঃখ যাবে, কিন্তু নীলিমা রইল, কে ওকে দেখবে? তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে। আমি মরলে, দেখো যেন ও ভেসে না যায়"—এই ব'লে বৃদ্ধা ভাবাবেগে কেঁদে ফেললেন। এমন সময় নীলিমা একখানা রেকাবে ক'রে দুখান পেঁপে, চারিখান বাতাসা আর একটি ছোট বাটিতে একটু দুধ নিয়ে আসল ও আমাকে জলযোগ করতে অনুরোধ করল। তাহার দৃষ্টি সহসা তাহার মায়ের উপর পড়ল—"কি মা, কাঁদছ কেন, কেঁদ না, বলেছি ত মা, আমার জন্য তোর ভাবতে হবে না। ভগবানের পায় আমায় সঁপে দেছ, তা কি ভুলে গেছ?" মায়ের অশ্রু ঝর-ঝর ক'রে গড়াতে লা'গল। আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইলাম।

কোন রকমে রাতটা কেটে গেল, প্রভাতে মায়ের জরুরী চিঠি অবহেলা না করতে পেরে চ'লে আসতে হ'ল। আসবার আগে নীলিমাকে

বললাম—"নীলিমা! আমি আবার আসব, দুঃখের দিনে তোমার এ অযোগ্য বন্ধুকে ভুলো না।"

সিংহীর মত গ্রীবাভঙ্গী ক'রে নীলিমা বলল—"দেখুন, আপনি আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করবেন, আপনার দয়া আমার চিরকাল মনে থাকবে, কিন্তু নিজের ঋণ আর বাড়াব না—আপনি আমার কে যে, আপনার করুণা চাইব, সমাজ তা চাইতে দেবে না—আসুন, নমস্কার।"

এই ব'লে নীলিমা ঘরে চ'লে গেল। আমিও গম্ভীর হয়ে চিন্তার ভার বয়ে ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলাম।

তার পর নানা কাযে কয়েক মাস কেটে গেল। শরতের এক রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নে নীলিমাদের বাড়ী গেলাম। পুরীখানি নিস্তব্ধ, জনহীন; বিজন প্রান্তরের মত খাঁ খাঁ করছে। গ্রামে খোঁজ করলাম, কিন্তু সন্ধান হ'ল না। শুনলাম, নীলিমার মায়ের মৃত্যুর পর সে কোথায় চ'লে গেছে, কেহ তাহা জানে না। তার পর কত খোঁজ করেছি, কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছি; কিন্তু নীলিমার আর উদ্দেশ পাই নি। জানি না, কোন অজানা পথে সে কলসী কাঁখে জল আনতে যায়, আর থেকে থেকে অতীতস্মৃতির পানে ফিরে চায়। জানি না, সে এই এক নিশীথের অতিথির কথা স্মরণ করে কি না—তবে সেই দুর্য্যোগ রাত্রির অপূর্ব্ব আলো-ছায়া, সেই অনুপমা রূপসীর আলো-ছায়ার সঙ্গে মিশে এখনও মনকে ঘিরে রেখেছে।

নীপেশ থামিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তবে একটা উদাস হাওয়া আমাদের প্রাণ কাঁপাইয়া বহিয়া গেল আর বাহিরের হেনা-ঝাড়ের মদির গন্ধে ঘরটাকে ভরিয়া ফেলিল।

বুড়ার ভালবাসা

১

গল্পের নায়ক তাহাকে হইতে হইবে, ইহা তাহার পিতামাতা নিশ্চয় জানিত না। জানিলে তাহার নাম হয় ত পেলারাম কেহ রাখিত না। পেলারামের বাড়ী দ্বারকেশ্বর নদের বালুতীরের শেষে মধুপুর গ্রাম। শালবনের শেষে কমলবাঁধ যেখানে স্বচ্ছ রৌদ্রে ঝলমল করে, তাহার পাশেই তাহার কুঁড়ে-ঘর।

দুই বিঘা বাইদ জমীর পাশে একটুখানি ডাঙ্গা জমী। পেলারামের ঠাকুরদা সেখানে কুঁড়ে-ঘর বাঁধিয়াছিল। জানালাহীন মাটীর দেওয়াল উপরে খড়ের ছাউনি, রৌদ্রবৃষ্টির অভিঘাত তাহার উপর বহুবর্ষের স্মৃতি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই কুঁড়ে-ঘরে পেলারাম নিঃসঙ্গ দিন যাপন করে।

বুড়ার ভালবাসা

পশ্চিম-বাঙ্গালার তৃষাতুর মৃত্তিকা চারিদিকে খাঁ খাঁ করে, উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া গৈরিকরঞ্জিত পল্লীপথ চলিয়া গিয়াছে, দূরে গ্রামের তরুশ্রেণীর শ্যামলতা দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলে। চারিদিকের রুদ্র শূন্যতার মাঝে সেখানেই হয় ত একটু তৃপ্তি আছে।

সেই পথ দিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পল্লী-ভামিনীদের যাতায়াত। কমল-বাঁধের জলে তাহারা দলে দলে স্নান করে, জল লয়, তার পর গল্প করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়।

পেলারামের ক্লান্ত চোখের সম্মুখে ইহারা পৃথিবীর পরিচয় জানাইয়া যায়। বাহিরে কত সমারোহ, কত আয়োজন। মানুষে মানুষে কত প্রীতির ও স্নেহের সম্বন্ধ। কত রসালাপ, কত মৃদুভাষ, কত হাস্য-পরিহাস, কত রসিকতা।

আর পেলারাম অন্যত্র একা দিন কাটায়। সেখানে কোন তরুণীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার শুনা যায় না, কোন শিশুরও কলকোলাহল নাই। শুকতারা যখন আকাশে ভোরের বাণী জাগায়, পেলারাম মুড়ি বেচিতে সহরে চলে। নিত্য বুড়ী মুড়ি ভাজে, সেই উনানের আগুনে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া পেলারাম বাহির হইয়া যায়, আর বেলা যখন দুইটা বাজে, তখন ক্লান্ত দেহে গৃহে ফেরে।

চুলা জ্বালিয়া যখন সে রাঁধিতে বসে, দেখে, হয় ত নুণ নাই, যদি বা নুণ থাকে, হয় ত তেলের অভাব ঘটে, এমনই করিয়া আধপেটা খাইয়া তাহার দিন চলে। আর স্মৃতির দরজায় কত কি আনাগোনা করে।

বেলা-শেষে চারপায়া বিছাইয়া তামাক টানিতে টানিতে যখন পল্লী-রূপসীদের যাতায়াত দেখে, তখন পেলারামের মনে নথ-পরা একখানি মুখের কথা জাগিয়া ওঠে। গরীব মানুষ, লেখাপড়া করে নাই, কাব্যচর্চ্চা

তাহার আসে না। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচিবার উদ্‌ভ্রান্ত পিপাসায় এ স্মৃতি-চর্চ্চা নহে। যে গিয়াছে, সে সুখে থাকুক, কিন্তু কতখানি অসুবিধা সে করিয়া গিয়াছে, তাহা না ভাবিলে চলে না।

মহামারী যে দিন মৃত্যুবাণ-হাতে দেখা দিয়াছিল, সে দিন পেলারামের স্ত্রী আর শিশুপুত্র রক্ষা পায় নাই। পেলারাম ত মরিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মরণকে যে কামনা করে, মরণ তাহাকে চাহে না। কাযেই শ্মশান-কৃত্যের শেষে পেলারামকে আবার নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন লইয়া চলিতে হয়। পোড়া পেটের আব্দার শোকের মান রাখিতে চাহে না। কাযেই সব ভুলিয়া আবার জীবনের নিত্যকার যুদ্ধে মাতিতে হয়।

এমনই করিয়া দুই বৎসর গিযাছে। যে শ্মশানে সাধের স্ত্রী ও পুত্রকে পোড়াইয়াছিল, তাহার অঙ্গার ছাপাইয়া বনফুল ফুটিয়াছে। গ্রামের মানুষ মহামারীর বেদনা ভুলিয়া আবার হাস্যগানে মাতিয়াছে।

পেলারামের জাতে মেয়ে কিনিতে হয়। তাই প্রথম বিবাহ করিতেই তাহার ত্রিশ বৎসর কাটিয়াছিল। সুখের দাম্পত্য-জীবন কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে বিধাতার বজ্র-অভিশাপ। অদৃষ্টের এই প্রচণ্ড পরিহাস চল্লিশে তাহাকে বুড়া করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রামের মাতব্বররা আসিয়া বলে—"পেলা, আবার বে থা কর্। এমন কষ্টে আর কদিন চলবে তোর? বয়স ত সবে দুকুড়ি বৈ ত নয়।"

পেলারাম ভাবে, "সত্যই ত, এমন করিয়া দিন চলে কেমন করিয়া?" অবশেষে পেলারাম স্থির করিল, সে বিবাহ করিবে।

আশার কুহক আশ্চর্য্য শক্তি ধরে। পেলারাম টাকা জমাইতে আরম্ভ করিল—এবার ক'নে কিনিতে চার কুড়ি পাঁচ কুড়ি টাকা লাগিবে।

২

শ্রীদাম বেড়াইতে আসিলে পেলারাম তাহাকে মনের কথা বলিল। শ্রীদাম গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কি, ভাই! অজয় গরাইয়ের মেয়েটা এবার চৌদ্দয় পা দিয়েছে, তোমার সাথে বেশ মানাবে।"

পেলারামের জাতে বড় মেয়ে পাওয়া যায় না। তাই পেলারাম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "অজয়ের মেয়ের এত দিন বিয়ে হয় নি কেন, ভাই?"

শ্রীদাম উত্তর দিল, "প্রথম পক্ষের ঐ ত এক মেয়ে, বাপের বড় আদুরে। তার পর অজয়ের খাঁই কম নয়।"

পেলারাম কথা গিলিতে লাগিল। শ্রীদাম বলিয়া চলিল, "সেবার নদেরচাঁদের ছেলে পতিতপাবন দুকুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিল। বেটা তাতে রাজী হয় নি। ছেলেটার সঙ্গে কায করবার ইচ্ছা ছিল, তাই পঞ্চাশ পর্য্যন্ত নিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু নদেরচাঁদের মরণ হওয়ায় সমস্ত ব্যাপার ফেঁসে গেল।"

আগ্রহোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পেলারাম জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি আশা আছে, ভাই?"

শ্রীদাম কৌতুকভরে পেলারামের দিকে চাহিল, পরে বলিল, "দুনিয়াটা কার বশ, জানিস ত?—টাকা, টাকা। রূপচাঁদ হ'লে যে বাঘের দুধও মিলে।"

পেলারাম চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে ছায়াচিত্রের ছবির মত একরাশি অসংলগ্ন চিন্তা ঘোরা-ফিরা করিতেছিল।

শ্রীদাম বলিল, "চার কুড়ি পাঁচ কুড়ি না হ'লে ভাই আশা নেই।"

পেলারাম উত্তর দিল না, মাথা নাড়িয়া শুধু উচ্চারণ করিল, "হুঁ।"

শ্রীদামের কায ছিল, সে উঠিয়া চলিয়া গেল। পেলারাম বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেলা-শেষের পড়ন্ত রৌদ্র কমলবাঁধের জলে শেষ বিদায় মাগিতেছিল।

মেয়েরা জল লইয়া ফিরিতেছিল। রোজই ফেরে, সে দিকে পেলারামের বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। আজ আশাতুর নেত্রে তাহাদের দিকে সে চাহিয়া দেখিতেছিল।

গ্রামের লোক, প্রতিবেশী, তাহাদের সবাইকে ত প্রায়ই সে চিনিত; কিন্তু আজ কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! যে মেয়েটি ছোট ছিল, সে আজ যুবতী হইয়াছে; নববধূ আজ মা হইয়াছে; প্রৌঢ়ার অঙ্গে জরার স্পর্শ লাগিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া পেলারামের মনে হইল, যেন তাহারা অচেনা অজানা লোক। তাহারা যেন অপরিচিত এক জগতে বাস করে, সে জগতের গতিবিধির সহিত তাহার কোনই যোগ নাই।

বহুক্ষণ পরে অভীপ্সিতের দেখা মিলিল। অজয় গরাইয়ের দশ বছরের ছেলে পলাকে লইয়া গরাই-নন্দিনী স্নানে চলিয়াছে। পেলারামের মনে চমক লাগিল। যৌবনের প্রথম লাবণ্য মেয়েটির অঙ্গে কান্তি জাগাইয়াছে, পেলারাম দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

গরাইয়ের মেয়েকে সবাই ফেলী বলিয়া ডাকে, সে নাম সংস্কৃত হইয়া কি দাঁড়াইবে, কে জানে? ফেলী সুন্দরী নহে, তবে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নহে। বয়ঃসন্ধির মাধুর্য্যে তাহাকে মোটের উপর ভালই দেখাইত। আর বুভুক্ষু পেলারামের হয় ত বিচারশক্তি ছিল না।

চাটাইতে শুইয়া যদি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা যায়, তবে চারপায়াতে বসিয়া রঙ্গীন আশার ফানুস রচনা করা চলে, এ কথা সমস্ত মনস্তত্ত্ববিদ্‌ই স্বীকার করিবেন। পেলারামও ফেলীকে সঙ্গিনী করিয়া ভবিষ্যতে কি আনন্দ লাভ করিবে, তাহার সুখচিত্র রচনা করিয়া চলিল।

মায়াবিনী আশা তাহার কুহকজাল পাতিয়া ধরিল। দুঃখের জীবনের পরে কি সুগভীর আরাম, নীলাম্বরী-পরা ফেলীকে কি সুন্দরই না দেখাইবে! এ সুখ-চিন্তার অন্ত নাই—সন্ধ্যার অন্ধকার তাহার চিন্তায় বাধা দিল।

পেলারাম উঠিয়া ঘরে যাইয়া দীপ জ্বালিল। তার পর দেওয়ালের ভিতের মাটীর মাঝ হইতে টাকাগুলি বাহির করিয়া গণিল—একবার দুইবার করিয়া বহুবার গণিল। পেলারামের ভাণ্ডারে দুই কুড়ি দশ টাকা ছিল।

৩

পরদিন বুড়াশিবের গাজনের মেলা হইতে পেলারাম একটি বাঁশী ও একখানি সুদৃশ্য চিরুনী কিনিয়া আনিল। বৈকালে যখন ফেলী পলার সহিত পুনরায় গা ধুইতে চলিয়াছিল, পেলারাম ডাকিয়া বলিল,"পলা, বাঁশী নিবি ?"

পেলারামের হাতে সুন্দর বাঁশী দেখিয়া পলা ছুটিয়া গেল। বাঁশী পাইয়া পলার খুসীর সীমা রহিল না। সে পেলারামের কাছে বসিয়া মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতে লাগিল। বাঁশীমুগ্ধ ভাইকে সঙ্গে লইবার জন্য ফেলীকে অগত্যা পেলারামের নিকটে যাইতে হইল। রুদ্ধ রোষে ফেলী গর্জ্জিয়া উঠিল, "ওরে হতভাগা, বাঁশী এ জন্মে দেখিস নি ?"

পলা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিল না। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব এখনও তাহার সহজ অনুভূতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। পেলারাম ত্রস্তভাবে উত্তর দিল, "রাগ করো না, লক্ষ্মীটি। পলা, তোর দিদির সাথে যা রে ভাই।"

পাড়া-গাঁয়ে মানুষ লজ্জাকে বেশী পোষণ করে না, আর পেলারাম বয়স্ক, ফেলী তাহার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিতে বাধা অনুভব করিল না।

"রাগ কিসের, তবে গুণধরের জন্য আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে কি না।" পরে পেলারামের হাতে সুন্দর চিরুণীখানি দেখিয়া অকুণ্ঠিত-চিত্ত ফেলী বলিল, "বা! বেশ জিনিষ ত, তোমার ত বউ নেই, কে পরবে?"

স্নেহার্দ্র কথায় পেলারামের দুঃখ নিবিড় হইয়া উঠিল। সে ছল-ছল-চোখে উত্তর দিল, "শিবপুরের মেলায় মনের ভুলে কিনে ফেলেছি, তুমি নেবে?"

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ফেলী। অল্পবয়সেই তাহারা সংসারকে চিনিয়া লয়। কাযেই পেলারামের বেদনাপ্লুত কণ্ঠ ফেলীকে ভাবনায় ফেলিয়া দিল। যে মানুষ অন্যের আঘাতকে রূঢ় আঘাতে ফিরাইয়া না দিয়া ব্যথায় তাহাকে গ্রহণ করে, তাহাকে পুনরায় আঘাত দেওয়া চলে না। কাযেই ফেলী বলিল, "আচ্ছা, কিন্তু কত দাম হয়েছে?"

পেলারাম যদি যুবা হইত, হয় ত বলিত, "হে সুন্দরি! তোমার মোহন হাসির পলকেই যখন মন-প্রাণ বিকিয়েছি, তখন আর লেনা-দেনার কথা কেন?" কিন্তু প্রৌঢ়ের মনে কেবল ব্যথাই লাগিল। সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "দাম জেনে আর কি হবে? আমি তোমায় দিলুম।"

ফেলী কথা না বলিয়া চিরুণী লইয়া গেল। এমনই করিয়া ভাব হইয়া গেল। ইহার পরে পেলারামের মনের ভুল বাড়িয়াই চলিল। পলার জন্য লজেন্স, তাহার দিদির জন্য চুলের কাঁটা, পলার জন্য বিস্কুট, দিদির জন্য রেশমী ফিতা আসিতে লাগিল।

এমনই করিয়া পেলারাম আবার শুষ্কমরু-মৃত্তিকায় জীবনের বার্ত্তা খুঁজিয়া পাইল। অর্থহীন, নীরস জীবনযাত্রাকে সঙ্গীতের সুরমাধুর্য্যপূর্ণ বলিয়া তাহার মনে হইল।

সে দিন সন্ধ্যায় শ্রীদামের কাছে যাইয়া পেলারাম তাহাকে ঘটকালি করিবার তাড়া দিল। শ্রীদাম আজকাল করিয়া কয়েক দিন পরে খবর আনিল, অজয় গরাই এক রকম রাজী, কিন্তু ছ'কুড়ি টাকা না দিলে হইবে না।

টাকাকে অনর্থ ভাবা সহজ। অকাযের বেলা বৈরাগ্য চলে, কিন্তু সংসার যখন চাপ দেয়, তখন টাকাই পথ দেখায়। কেমন করিয়া টাকা যোগাড় করিবে, পেলারামের বিষম ভাবনা হইল। ভাবী সুখের কল্পনা কিন্তু ভাবনাকে রসমধুর করিয়া তুলিত, তাই নৈরাশ্যের মধ্যেও প্রতিদিন সে নূতন নূতন আশা করিতে পারিত।

পেলারাম যাহাদের বাড়ীতে মুড়ি সরবরাহ করিত, তাহাদের নিকট দৈন্য জানাইয়া বিবাহের আবেদন করিয়া কিছু সংগ্রহ করিল। কোথাও কিছু পাইল, কোথাও তাড়া খাইল, কোথাও সংযমের বক্তৃতা শুনিল। এমনই করিয়া এক মাসে পনর টাকা সংগ্রহ হইল, আর ব্যবসায়ে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা লাভ করিল।

এখনও ৫০ টাকা বাকী। পেলারাম পাড়ার মহাজন শিবু সিংহের

নিকট ভিটাটি বন্ধক রাখিয়া ৫০ টাকা প্রার্থী হইল। শিবু ঐ সামান্য ভিটার দরুণ অত টাকা দিতে স্বীকৃত হইল না। খরিদ্দারকে নিরাশ করা শিবুর কোষ্ঠীতে নাই, শিবু মালা জপিতে জপিতে বলিল, "দেখ ভাই পেলারাম, এমন ত সহজ বিষয় নয়। ভাবনা-চিন্তা করেই ত কায করতে হয়, তুমি আর এক দিন এস, যা হয় একটা হিল্লে ক'রে দেবো। গুরু, তুমি সত্য!" শিবুর আঁখি ভক্তিতে নিমীলিত হইল। পেলারাম আশা-নিরাশার মেঘরৌদ্রে ঘরে ফিরিল।

গরীব মানুষ দুনিয়ার জীবনে উত্থান ও পতনকে অস্বীকার করে না। অলক্ষ্মীকে জীবনের বরযাত্রী মনে করিতে তাহাদের কবির আশীর্ব্বাদ লাগে না—দেনা করাকে তাহারা ডরায় না। পেলারাম সঙ্কল্প করিল, আগামী বৈশাখেই যেমন করিয়া হউক, তাহার ছন্নছাড়া জীবনে আনন্দের দূতকে ডাকিয়া আনিবে।

৪

চৈত্র-অপরাহ্ণ। সহসা কালবৈশাখী তাহার বিষাণ বাজাইয়া দিল, রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্যে পৃথিবী ক্ষেপিয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত ঝড় ধূলি উড়াইয়া দশ-দিক্ আকুল করিয়া তুলিল।

ফেলী জল লইতে আসিয়াছিল। পলা আজ সঙ্গে আসে নাই। ঝড়ের মত্ত নৃত্য দেখিয়া ভয়ে ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় সে পেলারামের গৃহে প্রবেশ করিল।

পেলারাম কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়াছিল। পথশ্রান্তির ক্লান্তিতে

সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ফেলী তাহার উদাস অবসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা! তোমার খাওয়া হয় নি?"

করুণ বিষণ্নভাবে সে উত্তর দিল, "না লক্ষ্মি, এই ত এলুম। যে ঝড়, না থামিলে ত আর রান্না চাপাতে পারবো না।"

"ঘরে কিছুই নেই? এখন কিছু খাও না।"

"ঐ ভাঁড়ে গোটাকত চিঁড়ে আছে।"

ফেলী নির্দ্দেশমত ভাঁড় হইতে চিঁড়ে লইয়া একটি পাথরবাটিতে ভিজাইল, পরে গুড়-তেঁতুল দিয়া পেলারামকে খাইতে দিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পেলারাম ক্ষুধার্ত্ত উদর তৃপ্ত করিতে বসিল। অমৃতের আস্বাদে যেন তাহার রসনা পরিপূর্ণ হইল।

"তোমার ত বড় কষ্ট হয়, পেলাদা?"

"কি আর করবো? ভগবান্ অদৃষ্টে কষ্ট লিখেছেন!"

"তা তুমি একটা বে-থা কর না কেন?"

পেলারাম সংযতস্বরে বলিল, "চাইলেই ত লক্ষ্মী ঘরে আসে না, গরীব যারা, তাদের দুঃখ ত কেউ বোঝে না।"

বাহিরে ঝড় উতলা হইয়া ফোঁস-ফোঁস করিতেছিল। ফেলী নিরুত্তর হইয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

পেলারাম ফেলীর মুখের পানে তৃষাকুল নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে প্রথম-যৌবনের দুর্দ্দমনীয় আবেগ জাগিয়া উঠিতেছিল। সে কণ্ঠকে যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল, "ফেলী, এই ঘরে তুমি আসতে চাও?"

ফেলী অন্যমনস্ক হইয়া ঝড়ের খেলা দেখিতেছিল। সে পেলারামের কথা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ?"

আমতা আমতা করিয়া পেলারাম তাহার প্রণয় জ্ঞাপন করিল। পেলারাম ফেলীকে তাহার ঘরের রাণী করিয়া তুলিবে। ফেলীর বাপ বিবাহে রাজী হইয়াছে। টাকা যোগাড় করিয়া আগামী বৈশাখে সে শুভকর্ম্ম করিতে পারিবে।

ফেলী অবাক্ হইয়া পেলারামের ভাবোচ্ছ্বাস শুনিতেছিল। বাড়ীতে এরূপ একটি কাণাঘুষা সে শুনিয়াছে, কিন্তু বিশ্বাস করে নাই। নদেরচাঁদের ছেলে পতিতপাবনের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, ইহাই সে বরাবর শুনিয়া আসিতেছে। পতিতপাবনের কাছে পেলারাম কোন রকমেই দাঁড়াইতে পারে না। পতিতপাবনের প্রতি ফেলীর কিছু মোহও জন্মিয়াছিল। গ্রামে সইরা তাহাকে পতিতের বধূ বলিয়া কত রঙ্গরস করিয়া থাকে।

পেলারাম থামিলে ফেলী ম্লানমুখে বলিল, "ও কি বলছ তুমি, পেলাদা? অমন করলে কিন্তু আমি ছুটে পালাবো।"

পেলারাম চমকিত হইয়া উঠিল! সুখস্বপ্নভোরে পেলারাম আদৌ ভাবে নাই যে, ফেলীর এই বিবাহে অমত হইতে পারে। ফেলী যখন তাহার যত্নহৃত উপহার লইয়াছে, পেলারাম ভাবিয়াছে, ফেলী তাহাকে পছন্দ করিবে।

তাই অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?"

ফেলী মুখে কাপড় গুঁজিয়া বলিল, "ও কথা আমায় বলো না, পতিতকে আমি বিয়ে করবো।"

উভয়েই নীরব হইল। বাহিরে তখন ঝড় ও জলের মাতামাতি

চলিয়াছিল—কালবৈশাখীর বিরাট সমারোহ বিশ্বজগৎকে কম্পিত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু ঘরের ভিতর বিরাট স্তব্ধতা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল।

ফেলী মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। লজ্জা ও দ্বিধা, সঙ্কোচ ও সরম তাহাকে নির্ব্বাক্ করিয়া রাখিল। পেলারামের মনে বিষম ঝড় চলিতেছিল।

সুশীতল বারি মনে করিয়া তৃষাতুর ব্যক্তি লবণ-হ্রদের বুকে ছুটিয়া আসিয়া যেমন দমিয়া পড়ে, পেলারাম তেমনই এক রূঢ় আঘাতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া পেলারাম বলিল, "কি রে ফেলী, তুই যে লজ্জায় খুব ঘাবড়ে গেলি: হাজার হ'ক, সম্পর্কে তোর ঠাকুরদা, একটু ঠাট্টা করলেই অমন মুষড়ে যেতে আছে কি?"

ফেলী চুপ করিয়া রহিল। অস্বাভাবিক মনের জোর সংগ্রহ করিয়া পেলারাম কৌতুকোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "ভয় নেই লক্ষ্মি! পতিতের সাথে যাতে তোর বিয়ে হয়—এই বৈশাখেই হয়, তার ব্যবস্থা করছি।"

ফেলী আত্মস্থ হইয়া বলিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্ট।"

হাসিতে হাসিতে পেলারাম বলিল, "এ দুষ্টকে তোর মনে ধরল না, যাকে ধরবে, তার যোগাড় করছি।"

"অমন ক'রে ক্ষেপাবে ত ভয়ানক রাগ হবে আমার।"

"তা মন্দ কি, ঘরে যেয়ে ভাত দুটি বেশী খেয়ো।"

"না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, ও সব আমি মিছে কথা বলছিলাম, তুমি এ সব কথা যদি কাকেও বল, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।"

পেলারাম এবার সহজ হাসির সুরে হাসিল। তার পর বলিল, "তা হ'লে পতিত বেচারীর কি উপায় হবে, দিদি?"

ফেলী চুপ করিয়া রহিল! তাহার মিনতিভরা ছলছল চোখ দুইটি পেলারামকে কাঁদাইয়া তুলিল।

"না ফেলী, তোর ভয় নেই, এ কথা আমি কাউকে বলবো না।"

বাহিরে ঝড়জল থামিয়া আসিয়াছিল। দিক্‌চক্রবালের শেষে সূর্য্য তাহার বিদায়রশ্মি দিয়া পৃথিবীকে অভিনন্দিত করিয়া তুলিতেছিল। ফেলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া গড় হইয়া পেলারামকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমায় তুমি মাপ করো, পেলাদা!"

পেলারাম উত্তর দিল না। কলসী লইয়া ফেলী বাহির হইয়া গেল। দিনের আলোয় জগৎ কালবৈশাখীকে তখন ভুলিতে বসিতেছিল, কিন্তু পেলারামের ভগ্ন হৃদয়ে চিরন্তন কালবৈশাখী তাহার তিমির-ভীষণ বজ্র-বাদলের আয়োজন চালাইতেছিল।

৫

সংসারের যাঁতাকল ঘুরিয়া চলিয়াছে। বিরামবিহীন তাহার যাত্রা, হৃদয়-হীন তাহার গতি।

কে কোথায় পিষ্ট হয়, কে খবর রাখে? প্রতিদিন সূর্য্য ওঠে, প্রতি-দিন সূর্য্য ডোবে। মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি?

পাখী গান গাহে, ফুল ফোটে, নদী ছোটে। মানুষ কাঁদুক আর হাসুক, তাহার কি?

পেলারাম পতিতের সহিত দেখা করিল। পেলারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে পতিত, বিয়ের কতদূর কি হ'ল রে?"

"না খুড়ো, টাকা সংগ্রহ করাই যে দায়, বাবার শ্রাদ্ধে মুখ্য সবাই বল্লেন, যা ছিল, সবই ব্যয় হয়ে গেছে।"

"তাই ত, বড়ই দুঃখের কথা, সে যা হ'ক, তুই এই বৈশাখেই বিয়ে ক'রে ফেল। ফেলী ত এখন বড়-সড় হয়েছে, বিয়ে না দিয়ে আর ওর বাপ কত কাল রাখবে?"

পতিতের মনে সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা থামাইয়া বলিল, "কিন্তু খুড়ো, টাকার যোগাড় করি কি ক'রে?"

"সে জন্যে কোন ভাবনা নাই তোর, আমার বিয়ের সময় তোর বাবা আমার বিশ টাকা সাহায্য করেছিল, নদের-দাকে সে টাকা কোন দিন দিতে পারি নি। বিয়ের খরচ কোনরকমে চালিয়ে দেব'খন।"

"না খুড়ো, সে কি হয়, তুমি গরীব মানুষ।"

"আমার ত আর তিন কুলে কেউ নেই, টাকা না হয় তুমি দেনা বলেই নেবে, পারলে ফেরৎ দিও, নয় দিও না।"

পতিতের ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিবার হেতু ছিল না। বিবাহ করবার সুখাশা তাহাকে লুব্ধ করিয়া তুলিল, কাযেই তাহাকে রাজি করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

পেলারাম পরে শিবু সিংহের নিকট যাইয়া নিজের ভিটা ও ধানী জমী বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল, এ প্রস্তাব শিবু সিংহের বিশেষ মনোমতই হইল।

"কি পেলারাম, ভিটে বেচে শেষে কি করবে?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, দেশে আর মন টিকছে না, এবার তীর্থ-ধর্ম্ম করতে যাবো।"

"তা যাবে বৈ কি, শাস্ত্রেই বলেছে, পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ। কিন্তু শেষে আমার নিন্দার ভাগী করো না।"

"না কর্ত্তা, আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বিক্রী করছি, আপনার কোন নিন্দা হবে না।"

"তা বাপু, জমীর দর এখন বড়ই সস্তা, তোমায় আমি একশ টাকার বেশী দিতে পারবো না বলছি।"

দর কষাকষি করিবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা পেলারামের ছিল না। পেলারাম সহজেই রাজী হইল।

পেলারাম জমী বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়া আসিল। বিক্রয় করিবার সময় শিবু সিংহের কাছ হইতে এক মাস থাকিবার অনুমতি লইয়া আসিল।

তার পর বৈশাখের এক শুভদিনে পতিত ও ফেলীর শুভপরিণয় হইয়া গেল। পেলারাম কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া ঘটা করিয়া ফেলীর বিবাহে উৎসবের আয়োজন করিল। বিয়ের দিনে পতিতের মারফতে একযোড়া সোনার বালা ফেলীকে গড়াইয়া দিল।

সহরে একটি লোকের সহিত পেলারামের পরিচয় হইয়াছিল। সে চা-বাগানের কুলীর আড়কাঠি। পেলারামকে সে বহুদিন ভজাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই রাজী করাইতে পারে নাই।

বিবাহের কয়েক দিন পরে চেলীপরা ফেলীকে পেলারাম যাইয়া বলিল, "আসি দিদি, আমি সহরে যাচ্ছি, কবে ফিরবো, জানি নে।"

ফেলী শুধু শুধু ছলছলনেত্রে চাহিয়া রহিল, কোন কথাই বলিল না। একা সেই জানিত, কতখানি সে ফেলীর জন্য করিয়াছে।

পেলারাম আসামে চা-বাগানে চলিয়া গিয়াছে। কমল-বাঁধের জলে এখনও তেমনই বীচিকল্লোল জাগে, গাঁয়ের গৈরিক পথে এখনও হাস্য-কৌতুকের শব্দ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

পেলারামের কথা সবাই ভুলিতে বসিয়াছে। যে যাহার নিত্যকার কাযে নিত্যকার জ্বালা লইয়া ব্যস্ত, অপরের জন্য ভাবিবার সময় কাহারও নাই।

কেবল গাঁয়ের বধূদের সঙ্গে যখন ফেলী জল আনিতে যায়, আর পেলারামের ভাঙ্গা কুঁড়ের পানে চায়, তখন একটি গভীর হাহাকার তাহার সারা অন্তর মথিত করিয়া তুলে!

আমার বন্ধু

১

বর্ষা-মেঘের ধূপছায়া সাড়ী যেন দিগ্বলয়ের সাথে আলিঙ্গন করিতেছে। নিঃসঙ্গ একটা পাখী বাঁশের পাতার 'পরে বসিয়া ধূসর আকাশের মৌনমূর্ত্তির পানে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিয়াছে। বনলতায় যে শ্বেত-পুষ্পগুলি নিতান্ত অকারণে ফুটিয়াছে, তার পাপড়ীগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। বর্ষা-দিনের এই অলস মধ্যাহ্নে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা আমাকে পীড়া দিতেছে, তাই হাতের বার্ণাড্‌ শ খানা রাখিয়া দিয়া মনকে স্বেচ্ছাচার বিচরণের অনুমতি দিলাম। পাংশুল আকাশের অলকারাশি অনেক দিন পড়া মেঘদূতের যক্ষের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। সেই কবে কোন্ অতীতে আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে বিরহী যক্ষ যে ব্যথা অনুভব করিয়াছিল, সে ব্যথা রসের নিত্যলোকে জমা হইয়া চিরন্তন মানবের চিরন্তন সম্পদ হইয়াছে। তাই মেঘের রাশি

দেখিয়া দেখিয়া একখানি সুন্দর মুখের কথা মনে পড়িতেছে। অর্দ্ধস্ফুট রক্ত-কমলকান্তি সেই গৌর মুখের শোভার সাথে একটা ফাল্গুনী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল স্মৃতিও ওতপ্রোত। সেই সন্ধ্যা আমার মনে একটা পরিপূর্ণ ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, তাই সে কথা মনে হইলে আমার দিন বেদনাতুর হয়ে উঠে। শুনিয়াছি, প্রকাশ হইলে নাকি ব্যথার তীব্রতা কমিয়া যায়, তাই আজ অনেক দিনের লুকান কথাটা তোমাদের শুনাইয়া দেই।

গোড়া থেকেই কথাটা আরম্ভ করা যাক। আমার ও তার মা উভয়েই শৈশবে পরস্পরের সখী ছিলেন। তাঁদের এই সখ্য জীবনের সমস্ত পরিবর্ত্তন ও ব্যবধানের মধ্য দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। দুই সইয়ের মাঝে আমিই প্রথম ধরিত্রী মাতার উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। তাই আমি মা ও মাসীমা উভয়েরই অপর্য্যাপ্ত আদরে, স্নেহে ও যত্নে বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম। তাই শিশু-জীবনে দুটি মায়ের আদর সমভাবে পাইয়া মাসীমার ভালবাসাটার প্রতিও আমার বিশেষ লোভ ছিল। কিন্তু এ আদর বেশী দিন টিকিল না। বাবা ছিলেন অধ্যাপক, পাঁচ বছর পরে তাঁকে অন্য স্থানে বদলী হইতে হইল। আমরা চলিয়া আসার বছরখানেক পরে 'গায়ত্রী'র জন্ম হয়। মাসীমার এই মেয়েটির নাম বাবাই পছন্দ করিয়া দেন। গায়ত্রীর জন্ম হইলে দুই সখী পরস্পর সংকল্প করিলেন যে, তাঁহাদের প্রীতির বন্ধনটি সত্যকার বন্ধনে পরিণত করিবেন। হায়! বিধাতা সে দিন বোধ হয় অলক্ষ্যে ক্রূর হাসি হাসিতেছিলেন। ভবিতব্যতা যে তাঁহাদের দু'জনের রঙ্গীন কল্পনা চূর্ণিত করিয়া দিবে, এ কথা সে দিন কেহই ভাবেন নাই।

২

গায়ত্রী দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় লাবণ্যে ও রূপে যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার গুণ-সৌরভ-মুগ্ধ মাতৃদেবী পিতাকে ভবিষ্যৎসম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। পিতা স্থির, ধীর, নির্ব্বাক্ ও মৌনী যোগীর মত, মাতার কথায় কখনও তিনি উচ্চবাচ্য করিতেন না, কাজেই মৌনং সম্মতিলক্ষণং মনে করিয়া মাতা ও মাসীমা তাঁহাদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতম করিয়া তুলিতে লাগিলেন। বৎসরে দু'-তিনবার মাতাঠাকুরাণী গায়ত্রীদের বাসায় যাইতেন ও দু'চারবার গায়ত্রী ও মাসীমা আমাদের বাসায় আসিতেন। কিন্তু জানি না কেন, কখনও গায়ত্রীর সহিত আমার চাক্ষুষ দর্শন হয় নাই। ইহাতে পিতার কোনও ইঙ্গিত ছিল কি না জানি না, তবে বিস্ময়ের বিষয়, গায়ত্রী বহুবার আমাদের বাড়ীতে আসিলেও, একবারও সে সময়ে আমি বাসায় ছিলাম না। কিন্তু গায়ত্রী তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনকে বেশ মধুরভাবে গ্রহণ করিয়াছিল; কারণ, সে আমার সম্পর্কীয় সমস্ত জনকে তার ভাবী-বধূ-জন-সুলভ সম্বোধনে ডাকিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। হায়, এই সরলা বালার হৃদয়পদ্মে প্রথম ঊষার রঙ্গীন আলোর মত যে মায়া আপনাকে রঙ্গাইয়া তুলিতেছিল, তাহা যে সংসারের তীব্র মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যে একেবারে উবিয়া যাইবে, ইহা কি কেহ তখনও ভাবিয়াছিল!

গায়ত্রীর এ কথা যাহা বলিতেছিলাম, তাহা তখন অধ্যয়নরত আমার মনে একটুও রেখাপাত করিতে পারে নাই। অধ্যয়নশীল পিতা লেখা-পড়াকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, তাঁহার পুত্র হইয়া তাঁহাকে অতিক্রম করি, ইহাই ছিল পিতার ইচ্ছা। সেই যে সনাতন কথা আছে, পুত্রাদিচ্ছেৎ

পরাজয়ম্, এ কথা বাবার পক্ষে আন্তরিক সত্য ছিল। তাই স্কুল ও কলেজের পঠন-পাঠনের বাঁধা গণ্ডী ছাড়াইয়া বৃহৎ জীবনের ছায়ালোকে বিশ্ব-সাহিত্যের ও বিশ্ববিদ্যার অর্জ্জনে আমার সমস্ত মন ও প্রাণ সমর্পিত হইয়াছিল। আমার তরুণ প্রাণের চারিদিকে পৃথিবী যে সৌন্দর্য্যধারা রঙ্গের লালিমায় ও গঠনের চারু ভঙ্গিমায় দিনের পর দিন সাজাইয়া রাখিত, তাহার দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না, সেই সৌন্দর্য্য ও সুষমার যে প্রতিচ্ছবি কাব্যলক্ষ্মীর পাতায় সঞ্চিত ছিল, তাহার প্রতিই আমার বিশেষ লুব্ধ দৃষ্টি ছিল।

৩

সেবার বি, এ, পাশ করিয়া এমে পড়িতে ভর্ত্তি হইয়াছি। দর্শনে এমে পড়িতেছিলাম। বাবা বলিলেন, আমাকে Thesis দিতে। আমি যে প্রবন্ধ দিতেছিলাম, তাহার নাম ছিল "গ্রীক ও য়ুরোপীয় দর্শনের অভি-ব্যক্তিতে ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যের প্রভাব।" বিষয়টি যেমন চমৎকার, সেইরূপই দুরূহ। অধ্যাপকগণকে অবাক্ করিয়া দিব, এই আশায় প্রাণপণে প্রবন্ধ-রচনায় মনোনিবেশ করিলাম। ঈশ, কেন, কঠ ও বেদান্তের কাব্য ও তত্ত্ব লইয়া যখন দিনের পর দিন আমার এক নিশ্বাসে উড়িয়া যাইতেছিল, তখন মকরকেতন তাহার অর্ঘ্য লইয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। গায়ত্রী সেবার চতুর্দ্দশবর্ষে পড়িয়াছিল, তাহার পিতা বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের অনুরোধ ও মাতার কাকুতি প্রবল বন্যার মত নিরীহ পিতার ও আমার মস্তকে আসিয়া পড়িল, তাহাতে আমাদের ভাসিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যশঃশ্রী যাহাকে মুগ্ধ

করিয়া দিল, প্রণয়ের আহ্বান তাহার কাছে ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি কঠোর কণ্ঠে বলিলাম যে, আমার বিয়ে করার সময় নাই। মাতা আসিয়া বলিলেন, "না জিতেশ! তুই অমত করিস না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস না। তাকে তুই দেখলে অপছন্দ করতে পারবি না—যে শ্রী আর যে কান্তি, একবার দেখে না হয় অমত কর।" কিন্তু মাতার এই স্নেহচঞ্চল অনুনয় বীরদর্পিত পুত্রের অন্তর মোটেই বিচলিত করিল না। পিতা মাতার জন্য একটু নরম হইলেন, বলিলেন—"জিতেশ এম, এ, পাশ করবার পর বছরই বিয়ে দেবেন।" কিন্তু পিতার এই অনিশ্চিত আশা কন্যাভারগ্রস্ত পিতৃবন্ধুকে নিশ্চিন্ত করিল না। পিতৃদেব সংস্কারকের প্রবৃত্তি ও কল্পনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সচল আগ্রহ অভাবে তাঁহার মতবাদ কর্ম্মীর দৃঢ়তা ও অবিচলতা লাভ করিতে পারে নাই। তাই যখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে চাহিলেন যে, তিনি কন্যাকে পরিণত-বয়সে পুত্রবধূ করিবেন আর পরিণত বয়সে কন্যাদের বিবাহের উপযোগিতা লইয়া দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন, তখন পিতৃবন্ধু নীরবে তাঁহার কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু এ আশ্বস্তি তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল না।

তাঁহাকে অন্য পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। আর অন্য পাত্রও জুটিয়া গেল।

৪

সে দিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্না সে দিন শতধারে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল। মধু-মাধবীর এই সুষমা-সম্ভারের দিনই গায়ত্রীর বিয়ের দিন স্থির হইয়াছিল। গায়ত্রীর বিয়েতে মাতা রাগ করিয়া গেলেন না, গৃহে বসিয়া তিনি আপন মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন, কাজেই আমার

মনে যাওয়ার যে দ্বিধাটুকু ছিল, তাহাও একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল। বাহাত্তরীর একটা লোভও বোধ হয় মনের গোপনতলে সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু সে দিন তা টেরই পাই নি। আমার মনের মধ্যে যে কোন বেদনার সঞ্চার হয় নাই—অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী গায়ত্রীকে অন্যে বিবাহ করিলে আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, লোকের চোখে এইটা প্রতীয়মান করিতে হইবে বলিয়া একটা মিথ্যা চেষ্টা আমাকে পাইয়া বসিল।

গায়ত্রীদের গৃহে যাইয়া মেসো মহাশয় ও মাসীমাকে প্রণাম করিলাম। তাঁহারা আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের ছেলের মত সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখিতে বলিলেন। আমার মনে হইল, মাসীমার কণ্ঠস্বর যেন বাধ-বাধ, তাঁর চোখের পাতাও ভিজে-ভিজে মনে হইল। কিন্তু সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া আমি বলিলাম—"আমাকে বিশেষ কিছু বল্‌তে হবে না মাসীমা, পড়াশুনাই শুধু যে করি, তা নয়, কাজও বেশ কর্‌তে পারি।" মাসীমা কোনও উত্তর করিলেন না, অন্য কি কাজে চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার কথাটি আমার কাছেই বিদ্রূপের মত শুনাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। চারিদিকে একটা ব্যস্ত কলবর সমস্ত বিয়ে-বাড়ীটাকে কল্লোলমুখর করিয়া তুলিয়াছে। সভামণ্ডপটিকে সুচারু ও পরিপাটী করা কেবলমাত্র শেষ করিয়া যখন দু মিনিটের জন্য একটা চেয়ারে বাসিয়াছি, তখন দূরে বাজনা বাজিয়া উঠিল। আলোর মালায় পথ দীপ্ত করিয়া বরযাত্রীরা ও বর উপস্থিত। মেসো মহাশয় ভিয়ান-ঘরের দিকে গিয়াছিলেন, বর-যাত্রীর কলরোলে সভামণ্ডপে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"দেখ জিতেশ, লগ্ন আজ সকাল সকাল, যাও ত, তোমার মাসীমাকে বল গে, গায়ত্রীর সাজগোজ তাড়াতাড়ি সার্‌তে।" অন্য সময় হইলে কিংবা চিন্তা

করিবার অবকাশ পাইলে মেসো মহাশয় হয় ত এই কাজটির ভার আমার উপর চাপাইতেন না—কিন্তু সে সময় তাঁর চিন্তা করিবার অবকাশ ছিল না। আমিও সুবোধ বালকের মত দুপ-দাপ শব্দে দোতলায় উঠিয়া গেলাম।

উপরে যাইয়া দেখি, পুরস্ত্রীরা সব বর দেখিতে বারান্দায় ভিড় জমাইয়াছে। মাসীমা সেই ভিড়ে নাই মনে করিয়া অন্য ঘর খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু মাসীমাকে পাইলাম না। ফিরিবার পথে দেখি, স্তিমিত দীপালোকে একটি কিশোরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভাল করিয়া চাহিতে বুঝিলাম, সে গায়ত্রী—। নববধূর বেশে সে সজ্জিত, কপালে চন্দনটীপমালা—লজ্জারুণ গণ্ডে বেশ সুন্দর মানাইয়াছে। পাশের জানালা দিয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্না গলা সোনার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহারই পাশে জ্যোৎস্নাব মত স্নিগ্ধকরী এক স্বর্ণপ্রতিমা দাঁড়াইয়া আছে। জানি না, মানুষের এত রূপ আছে কি না। কাব্য পড়িয়া অন্তরে যাদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি, গায়ত্রী তাদের সবার মহিমা খর্ব্ব করিয়া মহিমময়ী বেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত। মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত লজ্জা ভুলিয়া আমি গায়ত্রীর রূপমাধুরীর পানে চাহিয়া রহিলাম। ত্রিদিব-সুষমাকে লাঞ্ছনা করিয়া মর্ত্ত্যে যে পারিজাত ফুটিয়াছিল, ভগবান্ তাহা আমার জন্যই আনিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ঠেকারিতে সে পারিজাত পদদলিত করিয়াছি। হায়! মাতার সমস্ত অনুনয় অবজ্ঞা করিয়া কি অন্যায় কাজ না করিয়াছি! খানিক পরে ভাবচঞ্চল উদ্বেল স্বরে ডাকিলাম—"গায়ত্রি!" সে স্বরে হয় ত কম্পন ছিল, একটা আকুলতা ছিল। গায়ত্রী আমাকে চিনিয়াছিল কি না, জানি না। সে কোন উত্তর করিল না। শুধু তার সুন্দর মুখের

উপর কি যেন ভাবের লীলা খেলিয়া গেল। আমি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "গায়ত্রি, মাসীমা কোথায় ?"

গায়ত্রীর উত্তর করিতে হইল না, মাসীমা কোথায় ছিলেন, সেখানে আসিয়া বলিলেন—"কি জিতেশ, আমায় ডাকছ কেন ?" গায়ত্রী এবার মুখ তুলিয়া চাহিল। তার মধুর দৃষ্টিপাতে আমার অন্তরে অন্তরে যেন ছন্দ বাজিয়া উঠিতে লাগিল ! মাসীমাকে কোনপ্রকারে বক্তব্যটি জানাইয়া ত্বরিতবেগে নামিলাম। আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া আমার মনে হইল, যেন ধরিত্রী নাচিতেছে। আমি কি যে তখন অনুভব করিতেছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। ভিক্ষুক পথ চলিতে চলিতে যদি রত্ন কুড়াইয়া পাইয়া ফেলিয়া আসে, পরে অন্যে যখন সে রত্নকে আদরে তুলিয়া লইয়া সম্মান ও ঐশ্বর্য্য দুই-ই হাতে পায়, তখন ভিক্ষুকের অন্তরে যে জ্বালা জাগে, আমার মনে হইল, আমার অন্তরে সেই বিষদাহ উপস্থিত হইল।

চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি পরিস্ফুট মালার মত মনোহর গায়ত্রীর সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-সুকোমল রূপচ্ছবি আমার অন্তরে জাগিতে লাগিল। বিবাহসভা হইতে পলাইয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে আশ্রয় লইলাম। অবসাদ, নৈরাশ্য, বিতৃষ্ণা প্রভৃতি নানা ভাবের দোলায় দুলিয়া যখন মন অনেকটা শান্ত হইল, তখন আত্মস্থ হইয়া প্রবোধ লইলাম, "রক্তমাংসের যে গায়ত্রী আজ ললাম-লাবণ্যে অপরের অঙ্কশায়িনী হইল, জরা তাহাকে ম্লান করিবে, মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু আমি পূর্ণিমার ঐশ্বর্য্যে ভাসমান বেপথুমান যে মাধুরী দেখেছি, গায়ত্রীর সেই অরূপ মাধুরীই আমার বধূ হোক। সেই অমর সৌন্দর্য্যশ্রী আমার জীবনের সঞ্চয় হইয়া থাকুক।"

তার পর? তার পর আর কি? সেই সন্ধ্যার দীপ্ত মণিদীপের ধ্যান করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতেছি। যে গায়ত্রী আজ বহু সন্তানের জননী হইয়া সুখে গৃহধর্ম্ম পালন করিতেছে, সে গায়ত্রীকে আমি ভালবাসি, এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে—সে গায়ত্রীর খোঁজ আমি রাখি না—আমার মনের আয়নায় যার ছবি ফোটে, প্রকৃতির বর্ণভঙ্গিমায় যার প্রতিভাস দেখিতে পাই—সে গায়ত্রী অরূপ—সে এক ফাল্গুন-পূর্ণিমার মায়িক সৃষ্টি। বস্তু-লোকের তথ্যের মাঝে আমার প্রাণের এই সত্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এ সত্য শুধু প্রেমের আলোয় মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিয়া ওঠে।

ভাগ্য-ফল

১

সোনামুখীর নন্দ গরাই পাঠশালায় শুভঙ্করী শিখিয়াছিল। পণ্ডিত হরেরাম ভট্টাচার্য্য বলিতেন, "নন্দ! তুই আমার নাম রাখতে পারবি।"

কালে তাহাই হইল। প্রাপ্তবয়সে বিঘাকালি করিতে হইলে নন্দকেই লোক ডাকিত। নির্ভুল গণনার জন্য লোক তাহার সমাদর করিত। চাষ-বাস করিয়াও পয়সা জমিয়াছিল, কাজেই গ্রামে নন্দ যথেষ্ট প্রতিপত্তি-শালী ছিল।

বেশী বয়সে নন্দর ছেলে হইল। ধুমধাম ও উৎসবের সীমা রহিল না। জন্মের নবম দিনে গ্রহাচার্য্য আসিয়া বলিলেন, নন্দর পুত্রের রাজযোগ

আছে। নন্দ উল্লসিত হইয়া উঠিল। গ্রহাচার্য্যকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া কোষ্ঠী রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইল।

তিন মাস পরে গণক কোষ্ঠী আনয়ন করিল। রাশিচক্রের গ্রহসংস্থান হইতে দৈবজ্ঞ যখন সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়িয়া শুনাইল, আনন্দে নন্দর চক্ষু দুইটি ছল-ছল করিতে লাগিল। নন্দ তুলট-কাগজে লগ্নকুণ্ডলী তুলিয়া লইল। যখনই যে গৃহে আসিত, তাহাকে তাহা দেখাইয়া পুত্রের ভাবী সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলিত।

তুলট-কাগজে রাশি-চক্র এইরূপ লেখা ছিল ঃ—

দৈবজ্ঞ সংস্কৃত বিকৃত করিয়া বলিত ঃ—

যদা চ সৌরিঃ সুররাজমন্ত্রী পরস্পরং পশ্যতি পূর্ণদৃষ্ট্যা।
তদা সমগ্রাং বসুধামুপৈতি কিং বা ধনেনান্যগুণেন কিংবা॥

এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া নন্দ ভাবী সৌভাগ্যের একখানি

মনোরম আনন্দ-চিত্র রচনা করিত। আশা কুহকিনী, তাহার মায়াজাল অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান করে। দুঃখদুর্ব্বহ দিনগুলি এই আশার মোহে কাটাইয়া হঠাৎ এক দিন নন্দ পরলোকে চিত্রগুপ্তের নিকট জবাবদিহি করিতে চলিল।

পুত্র রাজেন্দ্র তখন ষোল বৎসর বয়সেও পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুতে রাজেন্দ্র চোখে সর্ষে-ফুল দেখিল। বাল্যকাল হইতে নিজের ভাবী ঐশ্বর্য্যবার্ত্তা শুনিয়া রাজেন্দ্র রাজকীয় চাল যত আয়ত্ত করিয়াছিল, বিদ্যা তত আয়ত্ত করে নাই। পিতা নন্দও ব্যবসায়কর্ম্মে ঢিল দিয়া পুত্রের জন্য বিশেষ সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

পিতার মৃত্যুর পর চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে যখন রাজেন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল, তখন নিজের বয়সের তারতম্য সহপাঠীদের সহিত তাহার প্রীতির কারক না হইয়া বিরাগ ও বিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমান্ শিক্ষকপ্রিয় ছাত্র তারক যে দিন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বুড়ো ধাঙ্গড়! শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকতে তোর লজ্জা করে না?" সে দিন রাজেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিল না। কচি ছেলের পাকামী তাহার অসহ মনে হওয়ায় বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড় মারিয়া যে ক্লাশ হইতে বাহির হইল, সেই চিরকালের জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

আত্মীয়-স্বজন আসিয়া বলিল, "এবার বে-থা কর্, ঘরগৃহস্থালী পাতিয়ে মনের সুখে থাক্।" কিন্তু নিজের ভাগ্যের প্রাপ্য রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্যের লোভ তাহার গোপন মনে কায করিয়া চলে। তাহার উপর নভেল-পড়া, কুন্দ-কলিকা নব-নলিনীদের সহিত তাহার ভাবী কনে'দের কাহারও

মেলে না। পুঁটি, ফুটি, পাঁচী, রামী, শ্যামীদের যেমন কালো কুচকুচে চেহারা, তেমনই কথা বলিবার ভঙ্গী। কাযেই রাজেন্দ্র বিবাহে সম্মত হইল না। কলিকাতার কথা শুনিয়া রাজেন্দ্র মনে করিত, সেখানে গেলেই বোধ হয় সোনা ফলিতে পারে। কত লোক পথের ভিখারী হইতে লক্ষপতি হইয়াছে, রাজেন্দ্র তাহাদের কথা লুব্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীর মত নিত্য শুনিয়া শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ২৪ বর্ষ বয়সে রাজেন্দ্র পিতার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক দিয়া হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম-মসগুল কলিকাতায় যাত্রা করিল। প্রথমে কলিকাতার বিলাসের দিকে রাজেন্দ্রের দৃষ্টি পতিত হইল, দিন কয়েক খুব স্ফুর্ত্তি করিয়া লইল। পরে নানাজনের পরামর্শে রাজা হওয়ার খুব সোজা সোজা সকল পথ পরখ করিয়া দেখিল; কিন্তু গ্রহচক্রের ফল কোথাও ফলে না। এক মাড়োয়ারী রাজেন্দ্রের কোষ্ঠীর ফলাফল পড়িয়া তাহাকে অংশীদার করিয়া লইল। কিন্তু ছয় মাস না যাইতেই সে কারবারের মালিককে গণেশ উল্টাইতে হইল।

দিন কতক Exchange market, Share market প্রভৃতি স্থানে নিয়মমত পায়চারী করিয়াও কোন সুবিধা জুটাইতে পারিল না। কয়েক মাস কয়েক জনের অধীনে কায করিল বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহার কোনও সুফল ফলিল না। তুলট-কাগজের কোষ্ঠী নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে, আর বসিয়া বসিয়া ভাবে।

এমনই করিয়া নিরাশার তমসাবৃত অন্ধকারে রাজেন্দ্র ডুবিতে লাগিল। হাতের টাকাও ফুরাইয়া গেল। বাড়ী হইতে প্রাচীন বই যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা একটি পেঁটরায় বাঁধা ছিল। নাড়িতে

নাড়িতে দেখা গেল, তাহার ভিতর কতিপয় প্রাচীন পুথি রহিয়াছে।

পুথিগুলি জ্যোতিষের। জ্যোতিষের উপর অগাধ বিশ্বাস থাকায় বাল্যকাল হইতে রাজেন্দ্র জ্যোতিষ কিছু কিছু শিখিয়াছিল। হরেরাম ভট্টাচার্য্যের পুথিগুলি প্রিয়শিষ্য নন্দ গরাই পাইয়াছিল, কালচক্রে বিপদের দিনে তাহা রাজেন্দ্রের হাতে পড়িল।

রাজেন্দ্র অভিনিবেশ সহকারে পুথিগুলি পড়িয়া চলিল। হরেরাম ভট্টাচার্য্যের সঙ্কেত ও ইঙ্গিত মিলাইয়া জিনিষ কতকটা বুঝিয়া লইল।

নূতন একটা মতলব মাথায় ঢুকিয়া পড়িল। রাজেন্দ্র মনে করিল, জ্যোতিষগণনা করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবে। পুঁজির কয়েকটি টাকা খরচ করিয়া ধর্ম্মতলায় সে একটি ছোট কামরা ভাড়া লইল, তাহাকে সুদৃশ্য ও সুরম্য করিয়া সাজাইল। পরে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় Sign-board টাঙ্গাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল।

২

বন্ধু পরেশ আসিয়া বলিল, "ভাই, বিজ্ঞাপনের যুগ, বিজ্ঞাপন চাই।" রাজেন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তাই ত! কিন্তু বেশী টাকা খরচ করতে পারছি না, ভাই।"

পরেশ উত্তর দিল, "সে জন্য বেশী ভাবনা নেই, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু আজকাল সাহেবী চাল না হ'লে, ভাই, চলে না। তুই ত বেশ ইংরাজী বলতে পারিস, বিজ্ঞাপনের জোরে সাহেব-সুবোও হয় ত আসতে পারে।"

"পারে বৈ কি, নিশ্চিতই আসবে, জানিস, আমার রাজযোগ আছে ?"

"সে জানি বলেই ত বলছি। কিন্তু বখরায় সিকি আমার, বুঝলে ভাই ?"

"না, তা কি হয়, তোকে এক আনা দিতে পারি।"

"আচ্ছা, তা হ'লে দু-আনা দিস ?"

"বেশ, তাই হবে।"

পরের দিন কলিকাতার সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল। রঙ-বেরঙে ছাপা, ছবিতে নয়নভুলানো। লোকে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িল!

স্বপ্ন না বাস্তব ? বাস্তব না স্বপ্ন ?

সত্যই যুগান্তর ?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী

মিঃ আর. গুররে

ভূত ও ভবিষ্যৎকে আপনার নিকট প্রত্যক্ষ

দেখাইয়া দিবেন।

আমেরিকা, জাপান, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতে

প্রত্যহ নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

শত শত লোকের অনুরোধে মাত্র কয়েক দিনের জন্য

কলিকাতায় থাকিবেন।

আসুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন!

বিজ্ঞাপন বাহির হইল। তাহার পর হইতে প্রত্যহ দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালী চতুর জাতি, পয়সা বেশী দিতে চাহে

না। যে দু'এক জন মাড়োয়ারী ও সাহেব আসিল, তাহারা কিছু কিছু মনোমত দক্ষিণা দিল।

ব্যবসায়ের রূপ ধরিতে পারিয়া রাজেন্দ্র ইংরাজী ও হিন্দী কাগজে পুনরায় চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দিল।

মানুষ নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গড়ে, কিন্তু তাহাতে সে তৃপ্ত নহে। অনিশ্চিতকে জানিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা কম নয়। কাজেই মানুষ বিপদের সময় সাহস সঞ্চয় করিবার জন্য, দ্বন্দ্বের সময় সংশয়-নিরসনের জন্য জ্যোতিষীর কাছে যায়।

রাজেন্দ্র দেখিল, অনিশ্চিত জানিবার জন্য আগ্রহ কোন জাতিরই কম নহে। কলিকাতায় পৃথিবীর নানা দেশদেশান্তর হইতে প্রত্যহ লোক আসিতেছে ও যাইতেছে। কত বিচিত্র তাহাদের মনোভাব। ইহাদের সকলের মনোরঞ্জন করিবার জন্য রাজেন্দ্র সুট্ কিনিয়া আপনাকে সুবেশে সজ্জিত করিল। কলিকাতার বিভিন্ন সমাজে ঘোরা-ফেরা করিয়া চলনসই ইংরাজী বলিতে শিখিয়াছিল। পাঠ ও কথোপকথনের দ্বারা দিন দিন তাহার বৃদ্ধি হইল। কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার হইতে রাজেন্দ্র চৌরঙ্গীতে একটি বড় ঘর ভাড়া লইল। তাহা বৈদ্যুতিক দীপমালায় ও আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করিয়া সে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিল।

৩

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এসপ্লানেডের সম্মুখে ফাঁকা আকাশে প্রকৃতি বর্ণসজ্জার আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু কর্ম্ম-ব্যাকুল মানুষের সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর কোথায়? সমস্ত দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

একখানি 'অষ্টিন-কার' রাজেন্দ্রের ভাগ্য-গণনালয়ে আসিয়া থামিল। প্রায় পঞ্চবিংশবর্ষীয়া সুন্দরী তরুণী আসিয়া দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী দরোয়ানকে আপনার কার্ড দিল।

রাজেন্দ্র কার্ড পাইয়া চকিত হইয়া উঠিল। আয়নায় নিজেকে দেখিয়া বিশৃঙ্খল কেশকে সুবিন্যস্ত করিয়া লইল। মুখে পাউডার ঘষিয়া লইল। কলিকাতার এক জন বড় সওদাগরের কন্যা মিস এডিথ ব্রাউন। ভয়ে ও শঙ্কায় তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

তরুণী ভিতরে ঢুকিয়া সুন্দরভঙ্গীতে বলিল, "নমস্কার মিঃ গুর্‌রে!"

পরে আপন সুন্দর হস্ত বাড়াইয়া দিল। রাজেন্দ্র প্রতিনমস্কার জানাইয়া কর-কম্পন করিল।

তরুণী বসিয়া বলিল, "দেখুন মিঃ গুর্‌রে, ভারতবর্ষের বিরাট সভ্যতার প্রতি আমার একটি অন্তরের টান আছে। কি অপূর্ব্ব দেশ! কি বিচিত্র সভ্যতা!"

ভাবাবেগে তরুণীর হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল।

রাজেন্দ্র উত্তর দিল, "যা বলেছেন, মিস্ এডিথ। সেই গৌরবময় সভ্যতা অস্তাচলে গেছে—আমরা অযোগ্য বংশধর, পূর্ব্বপুরুষের বিজয়-গরিমা কিছুই বাঁচাতে পারি নি।"

"আপনার বিনয় প্রশংসনীয়, কিন্তু শুনেছি, আপনি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষের উদ্ধারে মনোনিবেশ করেছেন—"

কথা কাড়িয়া লইয়া রাজেন্দ্র বলিল, "আমি কি-ই বা জানি। কালিদাসের নাম শুনেছেন ত কুমারী! কালিদাস যেমন বলেছেন, ভেলায় চ'ড়ে সাগর পার হ'তে যাওয়ার মত এ মন্দবুদ্ধির প্রয়াস!"

"আচ্ছা, আপনি কি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেন?"

অদ্ভুত প্রশ্ন! যে জ্যোতিষের ব্যবসায় লইয়াছে, সে কেমন করিয়া জ্যোতিষের নিন্দা করিবে?

উৎসাহে শ্লোক আওড়াইয়া সে জবাব দিল, "জানেন মিস! আমাদের শাস্ত্র বলেছেন ঃ—

'বিফলং সকলং শাস্ত্রং বিবাদস্তত্র কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ'।"

মিস এডিথ সংস্কৃত ভাল বুঝেন না। কিন্তু বক্তার বলিবার ভঙ্গীটি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

রাজেন্দ্র মিস এডিথের লাবণ্য-লালিম মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনার সময় এখন খারাপ যাচ্ছে; মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিপ্লব—"

"হাঁ, যা বলেছেন, আমি ভয়ানক দোটানায় পড়েছি।"

"সে আর বলতে হবে না। আচ্ছা, মনে মনে একটি ফুলের নাম করুন। করেছেন? বেশ, এইবার এই অক্ষর-চক্রে হাত দিন ত।"

মিস এডিথ হাত দিলেন। খানিক যোগ-বিয়োগ করিয়া, বহু মাথা ঘামাইয়া রাজেন্দ্র যেন বহু গবেষণায় উত্তর দিল, "বলুন ত, Rose নয় কি? ঠিকই গোলাপ-ফুলের নাম করেছেন আপনি।"

মিস এডিথ বিশ্বাসে ও উল্লাসে ফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠিকই ত!"

"গোলাপ সৌন্দর্য্যের কারক, রক্তবর্ণ, প্রণয়-দ্যোতক—ভাবী গৌরবের সূচনা করছে। আপনি নিশ্চয়ই কোন প্রণয়-সমস্যায় পড়েছেন। নয় কি ?"

তরুণীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। গভীর শ্রদ্ধায় তাঁহার মন নত হইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তরুণীর হাতে বিবাহের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কোন আংটী নাই, বড়লোকের মেয়ে, প্রণয়সমস্যা ব্যতীত তাহার অন্য কোন সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না।

রাজেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, এইবারে একটা ফলের নাম করুন। বেশ। করেছেন, বলুন, শীতকালের ফল না গ্রীষ্মের ?"

তরুণী উত্তর দিলেন, "শীতকালের।"

"বেশ, এইবার অক্ষর-চক্রে হাত দিন।"

তরুণী হাত দিলেন। রাজেন্দ্র পুনরায় মস্তক-সঞ্চালন করিল, অঙ্কমালা লইয়া যোগ-বিয়োগ করিল, পরে জিজ্ঞাসুর ব্যগ্রতায় বলিল, "Orange নয় কি ?"

তরুণী বলিলেন, "হাঁ, আপনি কেমন ক'রে মনের কথা ধ'রে ফেলেন ?"

"সে রহস্য আপনি বুঝবেন না, মিস্ !"

"তা ঠিক, তবু কৌতূহল হয়।"

"অনাবশ্যক কৌতূহল ভাল নয়, এখন শুনুন। কমলালেবু রসের প্রাচুর্য্যে সৌভাগ্যের পরিচায়ক, প্রিয়-সম্প্রাপ্তির দ্যোতক, মিলনের কারক। অতএব বুঝছেন, আপনার কোন ভয় নেই। এখন নিশ্চিন্ত-মনে আপনার মনের কথা বলতে পারেন।"

৪

তরুণীর মনে যে লজ্জা, সঙ্কোচ ও দ্বিধা ছিল, দূর হইয়া গেল। গভীর বিশ্বাসে তরুণী আপনার মনের দ্বন্দ্ব-কথা বলিতে লাগিল।

"দেখুন, আমার মা নেই। মা থাকলে যে সুবিধা হয়, আমার তা নেই। পুরুষের প্রণয়-নিবেদনকে যাচাই করতে আমার তাই বড়ই মুস্কিল হচ্ছে। আপনাদের দেশের মেয়েদের আমি খুব সৌভাগ্যবতী মনে করি। পিতামাতা তাঁদের যাঁকে পছন্দ ক'রে দেন, কন্যা অবলীলাক্রমে তাঁকে মেনে নেয়। একবার আমার মনে হয়, এটা একটা **abstract idea** মাত্র। বস্তুজগতে এই বাষ্পময় ভাবধারার কোনও ছাপই থাকে না। আবার যখন সুখী ভারতীয় দম্পতি দেখি, তখন ভাবি, না, নিশ্চয়ই আই-ডিয়া নয়, এর পিছনে প্রচণ্ড একটি সত্য নিশ্চয়ই কাজ করছে।"

রাজেন্দ্র ভারতীয় সভ্যতার প্রতি মমতাময়ী তরুণীর কথায় প্রসন্ন হইল। তৃপ্তচিত্তে তাই জানাইল, "মিস্ এডিথ, আপনার দৃষ্টি খুলেছে, আপনি ভারতীয় জীবনের মর্ম্মকথাটি জেনেছেন। দেখুন। আইডিয়া আগে, কাজ পরে। ভারতবর্ষ তার সারা জীবন ভাবের পিছনে ছুটে ভাবকে করতলগত ক'রে নেয়।"

মিস্ এডিথ বলিল, "আমার প্রেমের দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী। জোকে আমি কিশোরকাল থেকেই জানি। বড় বড় দুটি আয়ত চোখ যেন কোন অজানার পানে চেয়ে রয়েছে। তার সুন্দর মুখ যেন কল্পলোকের কি এক মোহে ভাস্বর হয়ে উঠেছে, কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব'লে বাবা জোকে আমল দিতে চান না। জোর প্রকৃতি বিভিন্ন। বাপের কাছ থেকে আমি

সাদাসিদে ভাব আর বিষয়বুদ্ধি পেয়েছি, কিন্তু আমার মা আইরিশ মেয়ে, তাই হয় ত আইরিশ যুবক জোর মোহ আমি ছাড়িয়ে উঠতে পারি না। ও যেন আমায় কাচপোকার মত টানে।

"বাবা চান, আমি পলকে বিয়ে করি। পল অবশ্য সুপুরুষ—খাঁটি ইংলিসম্যান। ওর জীবনে ভাবালুতার কোন ছায়া পড়ে না। জোকে ভাল না বাসলে হয় ত পলকে স্বামিরূপে বরণ করতে আমার আপত্তি হ'ত না, কিন্তু আমি দোটানায় পড়েছি।"

বাধা দিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "হাঁ, আর বলতে হবে না। আপনার মাতৃগ্রহ আর পিতৃগ্রহ পরস্পর শত্রু, আপনার মনের মধ্যে যে আইরিশ কল্পনা-প্রিয়তা, তা আপনার পিতৃগ্রহের বিরুদ্ধদৃষ্টিতে প্রতিপদে আহত হচ্ছে।"

তরুণী সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "Exactly so।" পরে থামিয়া রাজেন্দ্রের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। বিজাতীয় লোক, তাই অন্তরে বিশেষ লজ্জা জাগিল না। কুমারী এডিথ বলিল, "কিন্তু জো আমায় বিশেষ ধ'রে পড়েছে, কাল জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াচ্ছিলাম। জো কেঁদে বলেছে, 'আমায় না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হবে যাবে।' আমার প্রেমকে মহীয়ান্ করবার জন্য সে একখানি কাব্য লিখেছে। আমি যদি পলকে বিয়ে করি, তা হ'লে জোর জীবন মরু হয়ে যাবে।"

বিভিন্ন ভাষাভাষী দুই ব্যক্তি, তাই জীবনের নিগূঢ় কথা বলা চলিতেছিল।

"আমি উত্তর দিয়েছি, 'বাবার আমার মত কিছুতেই হবে না।'

তখন বলেছে যে, সে বড়লোক হবে, কিন্তু সোজাসুজি বড় লোক হওয়া যায় কি ক'রে, ভেবে পাই না।"

তরুণী আবার নীরব হইল। পরে বলিতে লাগিল, "ডার্ব্বি ঘোড়-দৌড়ের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। ঘোড়ার নাম দিলে কোন্ ঘোড়া জিতবে, তা কি আপনি বল্‌তে পারেন?"

রাজেন্দ্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "খুব পারি।"

মানুষের মন এইখানে অতি দুর্ব্বল! বাঞ্ছিতকে পাওয়ার জন্য দিবা-রাত্রি আমরা আকাশকুসুম রচনা করিতে থাকি।

অন্ধবিশ্বাসের দোলায় এডিথের মন দুলিতেছিল। সে ক্ষণিকের জন্য ভাবিল না যে, যদি জ্যোতিষী গণিয়া ঘোড়া ঠিক করিতে পারিবে, তাহা হইলে সামান্য দোকানদারী করিবার তাহার প্রয়োজন কি?

মিস্ এডিথ বলিল, "আমার মাপ কর্‌বেন, মিঃ গুর্‌রে। মা-হারা মেয়ের পরামর্শের লোক নেই, আপনাকে তাই বিরক্ত করছি।"

"কুণ্ঠিত হবেন না, মিস্! আমরা মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রয়েছি। গ্রহগণ নীল আকাশের অসীম ছাপিয়ে যে বাণী পাঠায়, মানু-ষের মঙ্গলের জন্য আমরা তাই প্রচার করি। এর ভিতর বুজরুকী নেই। বল্‌বেন, সব সময়ে ফল মেলে না, তার ভূরি ভূরি কারণ আছে। অনন্ত আকাশ অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশে হাস্যোজ্জ্বল; ঐ দূর শূন্য-মণ্ডল হ'তে মানুষের জীবনকে ওরা পরিচালনা করছে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সামান্য—গণনার সময় কোথাও সামান্য ভুলে সমস্তই ফেঁসে যায়।"

মিস্ এডিথ পকেট হইতে একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "আপনার উপকার মূল্যে অশোধ্য, তথাপি কিছু প্রণামী দিতে হয়।"

রাজেন্দ্র বৈরাগ্যের ভাণ করিয়া বলিল, "না, ওর জন্য ভাববেন না মিস্, আপনার মিষ্ট কথাই যথেষ্ট পুরস্কার, তবে সংসারযাত্রা আছে, এই যা—"

কুমারী কর বাড়াইয়া দিল। পরে নমস্কার করিয়া বলিল, "কাল এই সময়েই আবার আসব। আপনার Engagement নাই ত ?"

রাজেন্দ্র যেন মহা: ভাবনায় পড়িল। পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তাই ত! কাল যে টিকারীর মহারাজকুমার আসবেন বলেছেন, তা ছাড়া দৌলতরাম ঘনশ্যাম আসবেন—"

তরুণী বলিল, "আপনি চিঠি লিখে ও সব বরখাস্ত করুন। আপনার সময়ের মূল্য আপনি পাবেন।"

৫

তরুণী চলিয়া গেলে রাজেন্দ্র মহা ভাবনায় পড়িল।

আস্ফালন সে যথেষ্ট করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যকালে কি হইবে, ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইল না।

পরেশ বলিল, "ভয় কি দাদা, জৈমিনি পরাশর আউড়ে বেচারীকে ঘায়েল করবে।"

রাজেন্দ্র কথা কহিল না। বিদেশিনী এই সুরূপা সুন্দরীর করস্পর্শের অনুভূতি তখনও তাহার সারা অঙ্গে পুলক জাগাইতেছিল। তাহাকে ফাঁকি দিতে তাহার মন সরিতেছিল না।

এমন সময় রিং-রিং করিয়া 'কলিং বেল' বাজিয়া উঠিল। পরেশ আসিয়া কার্ড হাতে দিল। "পল এডমণ্ড, মার্চ্চেণ্ট।"

লম্বা-চওড়া যোয়ান পুরুষ। একটু কাঠ-খোট্টা গোছের ভাব।

পল আসিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল! কোনও অভিনন্দন করিল না। পরে বলিল, "দেখুন, আপনিই মিঃ গুর্‌রে?"

জ্যোতিষী ঘাড় নাড়িয়া প্রশ্নোত্তর দিল।

"আমি সোজা কথাই ভালবাসি। জ্যোতিষবিদ্যা একটা বুজরুকী বৈ ত নয়, ও সবে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। কিন্তু আগে যে মেয়েটি এসেছিল, ওকে আমার বিয়ে করতেই হবে, বিশেষ প্রয়োজন।"

হিন্দুসমাজে বিবাহে প্রয়োজনকে প্রেমের চেয়ে উচ্চাসন দেয়, কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজে প্রেমহীন মিলন চলে না, এ কথা রাজেন্দ্র বহু কাব্য ও উপন্যাসে পড়িয়াছে। কাজেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

তাহার বিস্মিত দৃষ্টির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া পল বলিল, "দেখুন মিঃ গুর্‌রে, প্রেম একটা মস্ত ফাঁকি, নভেল লিখতে ওর প্রয়োজন, কাজের জগতে দরকারই সব চেয়ে মাপ-কাঠি। মিস্ এডিথকে আমার চাই-ই চাই। ওর ভিতর যে ভারতীয় ন্যাকামি আছে, যে স্বপ্ন-বিভোর পাগ-লামি আছে, তা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না, কিন্তু তা হ'লেও ওকে বিয়ে করতেই হবে।"

রাজেন্দ্র সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তার কি করব?"

"বলছি, ব্যস্ত হবেন না। দেখুন, আমরা ব্যবসায়ী জাত, চুক্তির ভক্ত আমরা। আপনি যদি কাজ হাসিল করতে পারেন, দশ হাজার টাকা আপনার দক্ষিণা পাবেন।"

দশ হাজার! পুলকে রাজেন্দ্রের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল, "আমি কি করতে পারি?"

"শুনুন, কাজটা খুবই সহজ। ওকে আপনি স্বাভাবিক ভড়ং ক'রে বলবেন যে, তোমাকে যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, তার ছবি তুমি দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই মিস্ তখন কৌতূহলী হয়ে উঠবেন।"

"তখন?"

"তখন তাকে কৌশলে আমার ছবি দেখিয়ে দেবেন।"

"কি ক'রে দেখাব? আমি ত আর নখদর্পণ জানি না। আমাদের যে সব গুণী নখদর্পণ, পাণ-দর্পণ করতে জানেন, তাঁরা ওসব পারেন।"

"আপনার ওসব গল্প শুনতে চাই না। এটা বিজ্ঞানের যুগ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে আপনার কাজ সম্পন্ন হবে। এই আংটীটা নিন। এর সামনে একটি উজ্জ্বল শক্তিসম্পন্ন কাচ বসান আছে দেখছেন, আর নীচেই দেখুন একটা স্প্রিং। স্প্রিংটা টিপলেই আমার ছোট একটি ছবি কাচের নীচে চ'লে আসবে, আর কাচের মধ্যে বেশ বড় দেখা যাবে।"

রাজেন্দ্র আংটীটা দু'চারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। ছবি আসিলে পলের একটি সুন্দর মনোরম প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র এই দুষ্টামির মধ্যে লিপ্ত থাকিতে প্রেরণা পাইতেছিল না। কাজেই ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখব।"

"চেষ্টা কি? এ ত খুব সহজই। এ আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। দশ হাজার টাকা সোজা জিনিষ নয়, আপনার সারা জীবনের আয়। ভেবে কাজ করবেন।"

লোভ ও অসাধ্যসাধনের পিপাসা মনের মাঝে ভাবের তোলপাড় আরম্ভ করিয়া দেয়। জোর করিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "খুব সম্ভব পারব।"

পল বিরক্ত হইয়া বলিল, "সম্ভব নয়, একে সত্য করতে হবে। ব্যাপার কিন্তু বিশেষ গোপন রাখবেন।"

পল উঠিয়া বলিল, "গুড্ নাইট!"

প্রত্যুত্তরে রাজেন্দ্র বলিল, "গুড্ নাইট।"

৬

পরদিন সারাক্ষণ রাজেন্দ্র মনের ভিতর ভয়ানক অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। কি করিবে না করিবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তরুণীর কমনীয় লাবণ্য সময় সময় হৃদয়ের কোমল তারে বাঁশী বাজাইয়া তুলে, আবার লোভ আসিয়া থামাইয়া দেয়।

পরেশ বলিল,"ভাই, ঘাবড়ে যেয়ো না। মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার।"

রাজেন্দ্র মিথ্যা জোর লইয়া উত্তর করিল, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্ধ্যার সময় মিস্ এডিথ আসিল। সমস্ত ঘরখানি তাহার কলহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তরুণী একখানি কাগজে ঘোড়ার নাম লিখিয়া আনিয়াছিল। "দেখুন, রিকার্ডো আর বছর প্রথম হয়েছিল, কিন্তু লোকে বলছে, এ বছর 'এনা' ব'লে একটি নূতন ঘোড়া নামছে, তার জিতবার খুব আশা আছে।"

তরুণীর কথায় বাধা দিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, ও সব পরে শুনছি, আপনাকে তার আগে একটা অপূর্ব্ব জিনিষ দেখাতে চাই। কে আপনাকে সব চেয়ে ভালবাসে, মন্ত্রবলে তার ছবি আপনাকে দেখাতে পারি।"

মিস্ এডিথ উল্লসিত হইয়া বলিল, "বেশ, আগে তাই দেখান।"

রাজেন্দ্র বলিল, "বেশ, আপনি চোখ বুজে মনে মনে গভীরভাবে চিন্তা করুন। যে আপনার সকলের চেয়ে প্রিয়, সেই আপনাকে দেখা দেবে।"

কুমারী বিশ্বস্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইল। মিনিট দশেক পরে রাজেন্দ্র বলিল, "বেশ, এইবার চেয়ে দেখুন, আংটীর কাচে কিছু দেখতে পারছেন কি?"

মিস এডিথ বলিল, "Sorry, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"বেশ, আবার ভাবুন, এইবার আমি মন্ত্রসঞ্চালন করছি।" এই বলিয়া নানা ভঙ্গীতে রাজেন্দ্র হাত নাড়িতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, "আচ্ছা, এইবার দেখুন, ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন।"

তরুণী আগ্রহ-ব্যাকুল চিত্তে চাহিল, দেখিল, আংটীর কাচে পলের সুন্দর সুদৃশ্য আলেখ্য। ব্যথায় ও হতাশায় তাহার সারা মন এলাইয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে সে বলিল, "Oh God, Oh God!"

মিস এডিথ বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; সোফায় মাথা রাখিয়া সে চোখ বুজিয়া পড়িল।

গভীর বিশ্বাসে সে জোর মূর্ত্তি চিন্তা করিয়াছিল। ভাবনায় মানুষ সব সময় চায় যে, ঈপ্সিত বস্তুই দেখা দিবে। আংটীতে পলের মূর্ত্তি দেখিয়া এডিথের মনঃকষ্টের সীমা রহিল না। তাহার বোধ হইল, যেন তাহার মাথা ঘুরিতেছে।

সে কাতর স্বরে বলিল, "মিঃ গুররে, আপনার স্মেলিং শল্ট কিংবা অডিকলন আছে কি?"

রাজেন্দ্র পিছনের টিপয় হইতে স্মেলিং শল্ট বাহির করিয়া দিল। আঘ্রাণ লইয়া তরুণী যেন স্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। পরে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "মিঃ গুররে, ভগবান্ বিরূপ। আপনার দোষ নাই।—

আমার ভাগ্য।" পরে নিজ মনেই যেন বলিল, "My fate is sealed. My fate is sealed." তরুণী উঠিতে গেল, কিন্তু আবার সোফায় বসিয়া পড়িল। তাহার চারিদিকে পৃথিবী যেন নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাজেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, তরুণীর সুগৌর মুখমণ্ডল ফ্যাঁকাসে হইয়া উঠিয়াছে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "যা, দৌড়ে একটা অডিকলন নিয়ে আয়।" রাজেন্দ্র নিজেকে আর থামাইতে পারিল না। বিহ্বল তরুণীর বেদনার্ত্ত মুখ তাহার সমস্ত লোভকে জয় করিতে চাহিতেছিল। সে মনোবল সঞ্চয় করিয়া বলিল, "মিস, আমায় ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি ফাঁকি দিয়েছি।"

তরুণী উত্তর দিল না। তাহার মন তখন ভাবী অপ্রিয়ের সহিত একটি রফা করিবার জন্য যেন দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

রাজেন্দ্র আপনার কথা পুনরাবৃত্তি করিল। মিস এডিথ চমকিত হইয়া বলিল, "না মিঃ গুর্‌রে, আমায় ভুলাবেন না। আমি জানি, বহু জীবনে এই ঘ'টে থাকে। আমি নিজেকে তৈরী ক'রে নেবো। তবে প্রথমটা বড় আঘাত লাগে। আপনি আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করবেন।"

রাজেন্দ্র বলিল, "কুমারী! মিথ্যা নয়, সত্যই আমি মহা পাষণ্ড। অর্থের লোভে আপনার প্রেমকে বলি দিতে যাচ্ছিলাম।"

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তরুণী ফিরিয়া চাহিল।

রাজেন্দ্র তখন আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্ব-সন্ধ্যার কাহিনী বলিয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কুমারী সব শুনিল। তবু যেন ভয় ছাড়িতে চায় না।

রাজেন্দ্র তখন আংটীটা মিস এডিথের হাতে দিল। পর্য্যবেক্ষণের পর তরুণী চিনিতে পারিল, এই আংটীই সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে! রাজেন্দ্রের

প্রতি তাহার আর ক্ষোভ বা ক্রোধ হইল না। মুক্তির বিপুল আনন্দে সে জ্যোতিষীর লোভকে ক্ষমা করিতে পারিল।

রাজেন্দ্র তখন বলিল, "মিস, আমায় যদি বিশ্বাস এখনও করেন, তবে আপনার ও জোর জন্মতারিখ দিন, আমি আপনাদের যোটক বিচার ক'রে দিচ্ছি।"

মিস এডিথ বলিল, "আপনি মহাশয় লোক, লোভকে যিনি জয় করেন, তিনি মহাত্মা।"

রাজেন্দ্র উভয়ের জন্ম-তারিখ হইতে রাশি, নক্ষত্র, গণ ও বর্ণ বাহির করিয়া লইল। পরে পুস্তক নাড়িয়া বলিল, "মিস, আপনার ও জোর রাজযোটক, আপনারা খুব সুখী হবেন।"

কুমারী উঠিবার সময় নোট বাহির করিয়া দিতে যাইতেছিল। রাজেন্দ্র বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন, আমি কিছু নিতে পারবো না। ভগবান্ আপনাদের সুখী করুন।"

তরুণী কথা কহিল না। নীরবে বিদায়-সূচক হাত বাড়াইয়া দিল। কর-কম্পন করিবার সময় রাজেন্দ্র বুঝিল, যেন তরুণীর চিত্ত কৃতজ্ঞতায় আকুল হইয়া রহিয়াছে।

৭

সেক্সপীয়ার লিখিয়াছেন, জীবনের শুভলগ্ন একবারমাত্র আসে, তাহাকে হারাইলে সারা জীবন অনুতাপ করিতে হয়।

পরেশ রাজেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "তোমার সাথে ভাই, ব্যবসা বন্‌বে না। অত কোমল-চিত্ত নিয়ে সংসারে চলে না।"

রাজেন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

তাহার মনে প্রভাতী আকাশের অরুণিমার মত মাধুর্য্যময় একখানি মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল।

পরেশ চলিয়া গেল। কোন অজ্ঞাত শত্রুর জন্য এস্প্লানেডের বাসাও ছাড়িতে হইল। ধর্ম্মতলায় ছোট একখানি ঘর লইয়া রাজেন্দ্র জ্যোতিষের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। লোককে সে আর ফাঁকি দেয় না। শাস্ত্র যাহা বলে, তাহাই বলিয়া দেয়। আর বলিবার সময় শ্রোতাকে সমঝাইয়া দেয় যে, বিচারে বহু ভুল থাকিতে পারে। মেকির বাজারে সত্য চলে না। খাঁটি মালের গ্রাহক নাই, কাজেই রাজেন্দ্র দিন দিন বিপন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

যখন অভাবের পীড়া অসহ্য হইয়া উঠে, রাজেন্দ্র মিস এডিথের ভাবাবেগমধুর করস্পর্শের কথা চিন্তা করিয়া সান্ত্বনা লইতে চাহে।

ইংরাজী খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে রাজেন্দ্র এক দিন দেখিল, মিস্ এডিথ ও জো রিশারের বিবাহ হইয়াছে। কাগজে ইঙ্গিত ছিল যে, এ বিবাহে মিঃ ব্রাউন খুসী হন নাই।

সময় চলিয়া যায়। রাজেন্দ্রের দৈন্যদশা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। নিরুপায় রাজেন্দ্রের মনে হইল, "সংসারে সত্যের পথ জীবনযাত্রার পথ নয়। যারা ফাঁকিবাজ, তারাই দুনিয়ায় জয়মাল্য কেড়ে নেয়। পিতার সযত্ন-রক্ষিত তুলট কাগজে নিজের রাশিচক্র দেখিতে দেখিতে তাহার মন বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, "এই মিথ্যা প্রলোভনই আমার সারা জীবনটা মাটী ক'রে দিয়েছে।"

দুঃখে ও ক্ষোভে সে তুলট-কাগজ কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

সে সঙ্কল্প করিল যে, নিজের আসবাবপত্র বেচিয়া ফেলিয়া পশ্চিমে কোন তীর্থস্থানে যাইয়া জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইবে।

পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতার কাছে জ্যোতিষের বইগুলি বিক্রয় করিয়া যখন সে নিজের ঘরে ফিরিল, দেখিল, দরজায় পিয়ন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কালে-ভদ্রে তাহার চিঠি আসে। সে তাই তাচ্ছীল্য সহকারে বলিল, "কাকে খুঁজছ হে?"

"আপনাকেই বাবু! আপনার একটি রেজিষ্টারী খাম আছে।"

রসিদ দিয়া রাজেন্দ্র চিঠি খুলিল; দেখিল, ভিতরে একখানি খোলা চিঠি আর একখানি খাম রহিয়াছে। মিস্ এডিথ চিঠি লিখিয়াছে:—

"কার্সিয়ং, রোজভিলা,
৫ই জুন।

প্রিয় মিঃ গুর্‌রে!

তাড়াতাড়িতে বিয়ে হয়েছিল ব'লে আপনাকে জানাতে পারি নি। এখানে আমরা Honey-moon করতে এসেছি। জো আর আমি খুব সুখী হয়েছি। জোকে আপনার কথা বলেছি। সে-ও আপনাকে প্রীতি জানাচ্ছে।

বাবা প্রথমটা বড় চ'টে গিয়েছিলেন। আমাকে ত ত্যাজ্য করবেন ব'লে সঙ্কল্প করেছিলেন। পরে জানতে পেরেছেন যে, পল ভারী লম্পট ও জুয়াচোর লোক। তার অনেক টাকা দেনা রয়েছে।

পরশুদিন বাবা আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলেন। তাঁকে সব কথা বললে তিনি আপনার প্রতি এত খুসী হয়েছেন যে, আপনার মহানুভবতার পুরস্কার না দিয়ে ক্ষান্ত হ'তে পারছেন না।

আপনি আমাদের যে বিপদ্ থেকে রক্ষা করেছেন, তার তুলনায় এঃ প্রতিদান কিছুই নয়। গ্রহণ ক'রে অনুগৃহীত করবেন।

সঙ্গের চিঠিখানা নিয়ে বাবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি আপনাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের এক লাখ টাকার একখানি চেক দেবেন।

নমস্কার জানিবেন। ইতি

স্নেহ-প্রার্থিনী

মিসেস্ এডিথ রিশার।"

পত্র পড়িয়া রাজেন্দ্র অবাক্ হইয়া গেল। ভাগ্যের এ কি অদ্ভুত পরিহাস! যখন ফকির হইয়া বাহির হইবে বলিয়া সে পথে যাত্রা করিতে-ছিল, তখনই দৈবের এ কি অঘটন!

সামান্য নহে। লক্ষ মুদ্রা! কল্পনা করিতেও ভয় হয়। রাজেন্দ্র হাসিবে কি কাঁদিবে, ভাবিয়া পাইল না।

কাব্য-রোগ

১

কাব্য লিখিতে পারি না, কিন্তু যথেষ্ট পড়াশুনা করিয়া মন কাব্যরসে মসগুল হইয়া গিয়াছে। কাব্যের নায়ক-নায়িকা মনের পটে ছবি আঁকিয়া যায়, ভাবঘন চিত্তে স্বপ্নের ফুলঝুরি ঝরিয়া যায়।

মাতা লিখিলেন, "আমার সইয়ের মেয়ে রেবা এবার পনরয় পা দিয়েছে, এখন্ বিয়ে ঠিক করি।"

বিয়ে ত পুতুল-খেলা নহে। পুতুল-খেলার মেয়ে রেবাকে সঙ্গী করিয়া কবি-চিত্তকে মর্দ্দিত করা চলে কি?

বাহির হইয়া পড়িলাম। পকেটে সুইনবার্ণ আর হাতে কোডাক ক্যামেরা। দার্জ্জিলিং সহরে একা একা ঘোরাফেরা করি।

সংসারের লোক কবিতা চাহে না, তাই কবিদের বন্ধু নাই। কোডাক লইয়া নিত্য বনপথের ছবি তুলি, পাইনগাছের বনে প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি অলক্ষ্যে তুলিয়া লই। মুগ্ধ প্রণয়িযুগল জানিতে পারে না।

কাগজে যখন তাহাদের হাস্য-বিভাত মুখ দেখি, তখন মন হতাশায় ভরিয়া উঠে।

ভাবি, এ বিরাট দুনিয়ায় আমি একান্ত একেলা। আমার কেহ নাই, কেহ নাই!

প্রতিদিন মাসিকের পাতা উলটাইয়া পড়ি। কত লোক কত প্রকারে প্রেমের পরশ-মণি কুড়াইয়া পায়। আমারই কি দগ্ধ অদৃষ্ট? যখন চিন্তা চিতার মত অসহ হইয়া পড়ে, সুইনবার্ণ খুলিয়া বসি।

২

সে দিন বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রভাতের আলোয় কাঞ্চন-জঙ্ঘা ঝলমল করিতেছে। তরুপত্রে শারদোৎসবের বীণা বাজিতেছে। দূরে পর্ব্বতসানুতে একটি বিচিত্রপক্ষ বিহগ-দম্পতি বসিয়া শাল-মঞ্জরীর মধু পান করিতেছিল।

সুন্দর দৃশ্য। ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা তুলিয়া লইলাম। "Finder"এ দৃশ্যের প্রতিরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি। এমন সময়ে কল-হাস্যের ঝরণায় চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ফিরিয়া দেখি, তন্বী যুবতী। অবাক্ হইয়া চাহিলাম। সুন্দরীকে অনুমানে সপ্তদশ বসন্তের অধিকারিণী বলিয়া মনে হইল। গায়ে পেঁয়াজ-রঙা ব্লাউজের জরির মাধুরী বেড়িয়া

পেঁয়াজ-রঙা শাড়ী হিল্লোলিত। পায়ে উঁচু গোড়ালি-দেওয়া মেম-সাহেবী জুতা, চোখে চশমা। তরুণী একা। সহর হইতে দূরে কে এই বনবালা?

ভবভূতির ভাবায় মনে হইল—'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।"

তরুণী লজ্জা-সঙ্কোচ না করিয়া কোকিলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি তুলছেন? আমার একটি ছবি তুলবেন কি?"

নায়িকা-সমাগমের কল্পনা কত করিয়াছি। দেখা হইলে পৃথিবীর সেরা কবিদের মর্ম্মবাণী শুনাইয়া আমার মানসীকে অভিনন্দন করিব। কিন্তু সময়-কালে কণ্ঠ হইতে বাণী নিঃসারিত হইল না। আমি কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। আমাকে বিব্রত ও ত্রস্ত দেখিয়া তরুণী আমাকে কি ভাবিল জানি না।

তরুণী পুনরায় বলিল, "বা! আপনি চুপ ক'রে রইলেন যে? কি খাসা আপনার চেহারা! কিন্তু আপনার মন কি খুবই ছোট?"

লজ্জায় মাটীতে মিশিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ক্ষমা করবেন, আপনার যে কয়খান ইচ্ছা, ছবি তুলে নিচ্ছি।" মনে মনে বলিলাম, যদি ভাগ্যে হৃদয়-লক্ষ্মী দ্বারে দেখা দিয়াছে, তাহাকে কি অবজ্ঞা করিতে পারি? বিদ্যাপতির বচন মনে জাগিতে লাগিল :—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু প্রিয়মুখ-চন্দা।"

মনের সেই সুখ-স্ফূর্ত্তি অনির্ব্বচনীয়। কবিদের মঞ্জু শ্লোক যেন অস্পষ্ট ও অবোধ্য মনে হইতে লাগিল। কি নূতন অনুভূতি, কি বিচিত্র রস!

৩

তরুণী বলিল, "চলুন না, ঐ টিলাটায় বনমল্লিকার ফুলে আমার খোঁপা সাজিয়ে দাঁড়াব, আর আপনি আমার ছবি তুলবেন।"

সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। এ কথা কি কাব্যের না জীবনের? আজ মনে হইল, ইহাই সত্যের চিরন্তন শাশ্বত রূপ।

নির্জ্জন বনপথে তরুণ ও তরুণী। মনে মনে কত দ্বন্দ্ব, কত ভাব খেলিয়া যায়। পাইন-গাছের ছায়ায় টিলাটি দেখিতে সুন্দর ও শোভন। তরুণী উঠিতে অপারগ হইয়া বলিল, "আমার হাত ধরুন না।"

নিরুপায় আমি তরুণীর শিরীষ-কোমল হাত ধরিলাম। সারা অঙ্গে তাড়িত-রেখা বহিয়া গেল।

এ যেন নর ও নারীর আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুল স্পর্শ। চিত্ত উন্মনা হইয়া উঠে। পাইন-গাছের পাশ বাহিয়া বনমল্লিকা উঠিয়াছিল। তরুণী সেই ফুল তুলিয়া খোঁপায় পরিল।

পাইন-গাছের ধারে যখন হেলান দিয়া সে দাঁড়াইল, তখন তাহার চারু ভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। রূপদক্ষের বাঞ্ছিত আকৃতি, তাহার উপর সেই সুমধুর ব্যঞ্জনাময়ী ভঙ্গী।

ছবি তোলা হইলে তরুণী বলিল, "আসুন, এখানে বসি। দেখছেন, কাঞ্চন-জঙ্ঘা কেমন সুন্দর! আচ্ছা, বলুন ত, আপনি কাকে ভালবাসেন?"

অপরিচিতা তরুণীর এ কি প্রশ্ন!

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। তরুণীর কেশ-সুরভি আমার চারিদিকে যেন এক মোহের জগৎ গড়িয়া তুলিতে চায়।

তরুণী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "বলুন না? বলবেন না? বেশ, আমি আড়ি করবো বলছি।"

কি করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। বলিলাম, "আজও বিয়ে করি নি।"

"এ কি উত্তর আপনার? মানুষ কি কখনও বউকে ভালবাসতে পারে? আপনার স্বপন-লোকের প্রিয়া যিনি আপনার মনের মাঝে শুধু বিজলী-ঝলক দিয়ে যান, কে তিনি?"

এ কি প্রলাপ উক্তি?

তরুণীর নীলাভ আয়ত চক্ষু দুইটির উজ্জ্বলতা মুগ্ধ করিয়া তুলে। বুঝিতে পারি না—ইহা রহস্য না কৌতুক? ইহা প্রলাপ না মনের ভাষা?

সভয়ে বলিলাম, "এখনও কারও ভালবাসা পাই নি।"

"বলেন কি? আপনার মাঝে যে অনঙ্গ অঙ্গ ধরেছেন, রূপসীরা যে আপনার পায়ে রূপের অর্ঘ্য নিবেদন করবে।"

ত্রাসে শিহরিয়া উঠিলাম। তরুণীর বাক্যের যাদু আমাকে উতলা করিয়া তুলে। কিন্তু বলি বলি করিয়াও বারণ করিতে পারি না।

"আমায় ভালবাসেন কি? আপনার পায় পড়ছি, হাসবেন না। আমি বড় দুঃখী। মা আমার অল্পবয়সে মারা গেছেন, বাবা আবার বিয়ে করেছেন, আমার মনের ব্যথা দেখবার কেউ নেই।"

সহানুভূতিতে চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা, আপনি ত অনেক বই পড়েছেন। নারীর দুঃখ কিন্তু কেউ বুঝলে না। পুরুষের কাছে নারী চিরদিন সম্পত্তি। পুরুষ নারীকে জয় করতে চায়, কিন্তু—"

তরুণী চুপ করিল। নারী-পুরুষের এই সমস্যার কথা পুরাতন ও বাসি হইয়া গিয়াছে। ভাল লাগে না, আর এ সব মতবাদ লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি মোটেই রাজী নই।

আমার মুখের দিকে তৃষিত কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তরুণী বলিল, "আপনাকে বিরক্ত করছি কি?"

আমি সসম্ভ্রমে উত্তর দিলাম, "না, বলুন!"

তরুণী সভয়ে চারিদিকে চাহিল। শাড়ীর ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল, তার পর বলিল, "হাঁ, কি বলছিলাম? নারীর আত্মা আছে, এ কথা কি আপনি মানেন?"

তরুণীর মোহময় সঙ্গ ভাল লাগে, কিন্তু আবার অস্বস্তিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ভয় হয়, যদি কেহ আমাদিগকে এরূপভাবে দেখিয়া ফেলে।

উত্তর না পাইয়া তরুণী বলিল, "জানবেন, নারীরও আত্মা আছে।"

"নিশ্চয়ই, এ কথা কে অস্বীকার করবে?"

"বলেন কি? আপনি কি এ জগতের মানুষ ন'ন? এ জগতের সবাই বলেছে আর বলছে—নারীর আত্মা নেই।"

আমি বিস্ময়ে তরুণীর ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পাইন-তরুর ফাঁকে আলোর রশ্মি আসিয়া তরুণীর গৌরবর্ণকে আরও সুন্দরতর করিয়া তুলিল।

আমি ধীরস্বরে বলিলাম, "এ আপনি অন্যায় বলছেন, বর্ত্তমানের মানুষ নারীর কত সম্মান করে।"

তরুণী আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "ভুল, আপনার একান্ত ভুল,—আপনি আমার কথা শুনুন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন।"

অদূরে কোকিল-বধূ ডাকিয়া উঠিল। নির্জ্জন বনস্থলী কম্পিত হইয়া উঠিল।

তরুণী বলিল, "ঐ যে আর্ত্ত কোকিলা ডাকছে, ওর ভাষা কি আপনি কখনও পড়তে চেয়েছেন? বিরহিণী বধূর মত ঐ যে ও কাতরস্বরে ডাকছে—ও যেন আমারই অন্তরের ডাক। আমার ব্যথা যেন ওর মুখে সুর হয়ে উঠছে!"

আমি ত্রস্ত হইয়া বলিলাম, "বলুন, আপনার কিসের দুঃখ?"

"বলছি, না ব'লে আমার মনে শান্তি হবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

তরুণীর দৃষ্টি শূন্য, যেন কি এক চিন্তায় সে বিহ্বল হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "না না, আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, আমার এখন কোন কাজই নেই, আর আপনার কথা আমার খুব নূতনতর—মিষ্ট লাগছে।"

স্তোকবাক্য নহে, সত্যই এই অপূর্ব্ব তরুণীর অপূর্ব্ব কথোপকথন আমার হৃদয়ে নূতন এক ভাব জাগাইতেছিল।

খানিক পরে তরুণী যেন আত্মস্থ হইল, তার পর মেঘের পানে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখছেন, কি সুন্দর! দেববালারা সব সুরধুনীর তীরে জলকেলি করছেন—কি নয়নবিমোহন ছবি!"

আমি মেঘের লঘু সঞ্চালন দেখিলাম, কিন্তু অন্য কিছুই দেখিতে পাই-লাম না। বলিলাম, "কৈ, কিছুই দেখছি না।"

"দেখছেন না? না, তা দেখবেনই বা কি ক'রে, দেখতে হ'লে যে শক্তি চাই, তা আপনাদের নেই, ওই দেববালারা হয় ত নন্দনে পুষ্পমাল্য তুলছে, আর—"

তরুণী থামিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি তরুণীর সুগৌর আননমণ্ডলে নানা ভাববিবর্ত্তনের বিচিত্র লীলা দেখিতে লাগিলাম।

কতক সময় পরে তরুণী বলিল, "কি বলছিলাম? হাঁ, তাঁকে আমি খুবই ভালবেসেছিলাম, সারা মন-প্রাণ দিয়ে, যৌবনের উচ্ছ্বসিত আবেগ দিয়ে, সমস্ত ধ্যান দিয়ে, সমস্ত গান দিয়ে, সমস্ত কাব্য দিয়ে—"

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কাকে ভালবেসেছিলেন?"

"ওঃ, বলি নি বুঝি? তাঁর নাম অজিত। আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতেন। কি সুন্দর গঠন, অবিকল আপনার মত চেহারা। ভাল বাঁশী বাজাতেন। আমি জানালার পাশে ব'সে পড়তাম আর তিনি পাশ দিয়ে যেতেন। কি ভুবন-ভুলানো হাসি!"

তরুণী যেন কল্পনায় পুনরায় সেই হাসির স্পর্শ অনুভব করিল। পরে আরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার ঘুমন্ত নারী-প্রকৃতি জেগে উঠল। আমি মনে মনে বল্লুম, ওঁকে জয় করবো।"

"তার পর?"

"তার পর অনেক ঘটনা, মনে নেই, কিন্তু দিনে দিনে আমার ভালবাসা বেড়ে উঠল। আপনি শেলী পড়েছেন? অমন লেখা আর হয় না। শেলী যেন আমার মনের কথা জেনেই লিখে গেছেন। হাসবেন না, রাম না হ'তে রামায়ণ হয়েছিল। বলুন ত কোন্ শ্লোকটা?"

আমি শেলী যথেষ্ট পড়িয়াছি, কিন্তু তরুণী কোন্ কবিতার কথা বলিতেছেন, কেমন করিয়া বলিব?

যুবতী বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া পদগুলি যেন খুঁজিয়া পাইল। উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাই বলিল, "হাঁ, মনে হয়েছে, সেই অমর চরণগুলি :—

The desire of the moth for the star,

Of the night for the morrow.

The devotion to something afar.

From the sphere of our sorrow."

ইংরাজী যেন পোষাপাখীর মত তরুণীর কণ্ঠে নাচিতে লাগিল। উচ্চারণ কি সুন্দর! উল্লাসে তাহার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এমনই ভাব হ'ল। তিনি যেন আকাশের প্রোজ্জ্বল তারা, আর আমি যেন অন্ধকার লণ্ঠনের গায়ে আলোপিয়াসী পতঙ্গ; তিনি যেন হাসি-রঙ্গে ভরা উষার আলো, আর আমি যেন ব্যথা-বেদনার মসী-মাখা আঁধার রাত্রি। তাই আমার ভালবাসা কূলহারা হয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে গেল।"

তরুণী চুপ করিল। পরে শান্ত হইয়া বলিল, "তিনি আমার ভাল-বাসায় সাড়া দিয়েছিলেন, আমি বাবাকে বল্লুম, ওঁকে বিয়ে করবো। সবাই হেসে উঠল, বললে, 'তুই কি পাগল হয়েছিস?' আচ্ছা, বলুন, এ ভালবাসা কি পাগলামী?"

আমি বলিলাম, "তার পর?"

"বা! এ কি আপনি গল্প পেয়েছেন যে, কেবলই তার পর জিজ্ঞাসা করছেন? আমার ব্যথার গভীরতা হৃদয় দিয়ে বুঝবেন না?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে তরুণী কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ করলেন কি?"

"না।"

"রাগ করবেন না। আমি বড় দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার ব্যথা বুঝে না, সবাই শুধু বিধি-নিষেধের পাষাণ-কারায় বেঁধে রাখতে চায়। আপনি আমার ব্যথা বুঝছেন কি?"

বিপদের হাত এড়াইবার জন্য হয় ত বলিলাম, "হাঁ।"

"তিনি হতাশ হয়ে চ'লে গেলেন, বাবা আমায় বেথুনকারাগারে পাঠালেন। কিন্তু আমার মন ছুটে যায়,—ভারতসাগর পার হয়ে আরবদেশের খর্জ্জুর-বীথির মাঝে—"

"এখন তিনি কোথায় আছেন?"

তরুণী বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঐ যে আকাশে আপনাকে দেখালুম, দেববালারা তাঁর পূজার জন্য মাল্য রচনা করছে।"

খানিকক্ষণ কেহ কথা কহিলাম না। বহুক্ষণ আলাপে তরুণী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সহসা তাহার মনের মধ্যে কি যেন প্রবল ভাব জাগিয়া উঠিল। সে সরিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনাকে তাঁর মত দেখতে, আপনি আমায় ভালবাসবেন কি, বলুন?"

তরুণীর অঙ্গস্পর্শ আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। সম্মুখে সুধার সমুদ্রের মত তরুণীর রক্তগোলাপ সম অধরোষ্ঠ। প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। তরুণীকে প্রণয় নিবেদন করিব কি না, তাহাই ভাবিতেছিলাম।

এমন সময়ে জুতার মস্‌মস্‌ শব্দ হইল। তরুণী গলা বাড়াইয়া দেখিল, কে আসিতেছে। সহসা তাহার সমস্ত মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় সে ছুটিয়া পলায়ন করিল আমিও ত্রস্ত-ব্যাকুল-চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

৪

খানিক পরে দুই তিন জন ভৃত্যসহ একটি তরুণ যুবক আসিল। আকৃতি-সাদৃশ্যে তাহাকে তরুণীর ভাই বলিয়া মনে হইল।

যুবক প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়েকে এ দিকে দেখেছেন কি?"

"হাঁ, ব্যাপার কি, বলুন ত?"

"ওটি আমার ছোট বোন্ উৎপলা; বেথুনে বি-এ পড়ত, কলেজ-বই ছেড়ে কেবল বিদেশী উপন্যাস আর কাব্য পড়ত। বেশী পড়েই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

তরুণীর গোপন আশ্রয়-স্থান ভৃত্যদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "যা, তোরা ওকে বুঝিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

পরে তরুণীর ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "কোনও Love episode আছে কি?"

যুবক বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল, "কৈ না, তেমন কিছুই জানি না।"

"অজিত ব'লে কোন ছোকরাকে কি জানেন?"

"হ্যাঁ, সে আমারই সহপাঠী।"

"তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন কি?"

"না, সে লক্ষ্ণৌ কলেজে কাজ করছে।"

ভাবনায় পড়িলাম। তবু যাহা জানি, ভাইকে জানাইলাম:—"আপনার ভগ্নী কোনও অজিতকে ভালবাসেন, আর তাঁর ধারণা যে, তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন। এই ভুল ধারণা যদি ভেঙ্গে যায়, তবে হয় ত তাঁর রোগ সেরে যেতে পারে।"

যুবক নম্রচিত্তে বলিল, "আপনার কথা শুনে বড়ই খুসী হলেম। অজিতকে হয় ত উৎপলা ভালবাসে। অজিতকে চিঠি লিখছি, সে এলে হয় ত উৎপলা ভাল হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

বাসায় ফিরিলাম। সারাদিন মনের কোণে কি যেন কি ভাব জাগিয়া উঠে। বুঝিলাম, কত দুর্ব্বলচিত্ত আমি। মাকে চিঠি লিখিলাম, রেবাকেই বিবাহ করিব।

পরদিন মেলেই কলিকাতা ফিরিলাম।

৫

উৎপলার আর খবর লই নাই।

সে দিনের স্মৃতি শুধু আমার মনে নহে, চিত্রে আপন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সুন্দর সেই আলেখ্যটি ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট করিয়া শয়নকক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি।

রেবাকে সমস্ত বলিয়াছি। প্রিয়তমা পত্নীর নিকট হইতে জীবনের কোনও কাহিনী গোপন রাখিতে পারি না। তাঁহাকে সব বলিয়াছি।

মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া রেবা বলেন, "ঐ ত তোমার মানসী প্রিয়া?"

চপলা পত্নীকে বক্ষে ধরিয়া দুষ্টামীর প্রতিফল দিয়া বলি,"হাঁ, তাই বটে!"

কুপিত হইয়া প্রিয়তমা বলেন, "আমি তা হ'লে বাপের বাড়ী চ'লে যাই।"

আমি হাসিয়া বলি, "যাও!"

রাগ বাড়িয়া চলে, তখন স্বীকার করিতে হয়, "রেবাই আমার মানসী. রেবাই আমার ধ্যানের ছবি।"

রেবা খুসী হইয়া উঠে, পিয়ানোয় সুর দিয়া গান গাহিতে বসে।

রেবা গান গাহিতে জানে। সুরের ধারায় বিশ্ব প্লাবিত হয়, জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গান জাগিয়া উঠে।

নিমীলিত-নয়নে ভাবি—'উৎপলার সেই সঙ্গ আমার জীবনে কি রেখা রাখিয়া গিয়াছে?'

সুরের রণনে অব্যক্ত কি বেদনা চিত্তে রহিয়া রহিয়া খেলিয়া যায়। গান থামাইয়া রেবা জিজ্ঞাসা করে, "কি? তোমার ভাল লাগছে না?" কথা বলি না। রেবা চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে যেন আমার অলক্ষ্যে আদরের রেখা গণ্ডে রাখিয়া দেয়।

আমার মনে সেই পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। দার্জ্জিলিঙ্গের সেই নবমল্লিকাবল্লীজড়িত পাইন-গাছ—সেই সুন্দর প্রভাত, সেই বনবালার মত সরলা উৎপলা, সেই স্পর্শব্যাকুলতা, চলচ্চিত্রের ছবির মত মনের আয়নায় ভাসিয়া যায়।

কি যেন কি উদাস সুর মনে জাগিয়া উঠে। ভয়ে রেবাকে আদর করিয়া কোলে টানিয়া লই।

মা

নূতন হাকিম হয়েছি।

কাব্য ও গান, আনন্দ ও হাসি মিথ্যার আব-হাওয়ায় পিষ্ট হয়ে যায় যায়।

যারা সাক্ষ্য দেয়, তাদের জলজ্যান্ত মিথ্যা শুনে শুনে প্রাণ হয়রাণ হয়; আর ভাবি, বুঝি মিথ্যাটাই মানুষের সব।

কিন্তু সে দিন একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হ'ল। সত্য ঘটনা, তাই এটা উপন্যাসের চেয়ে বাস্তব।

কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল শুভ্রবাস-পরা বর্ষীয়সী বিধবা;—তার দারিদ্র্যের নগ্নতা স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। তথাকথিত ছোট-লোকের মেয়ে, কিন্তু তবু তার পাণ্ডুর মুখে কি যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ।

চোখ দুটি তার ছল ছল করছিল। প্রতিহত কান্না পথ-হারা হয়ে তার চোখকে চঞ্চল ও বেপমান ক'রে তুলেছিল।

ঘটনা—তার ছেলে খুনের দায়ে আসামী,—তার একমাত্র সন্তান মৃত্যুর দ্বারে। পুলিসের রিপোর্ট, ছেলেটি পাড়ার একটি মেয়েকে ভাল-বাসে। মেয়ের বাপ প্রথমে তার মেয়েকে কালুর সঙ্গেই বিয়ে দেবে বলে। এজন্য কিছু টাকাও সে কালুর কাছ থেকে নিয়েছিল।

কিন্তু মানুষের তৃষ্ণার শেষ কোথায়? কিছু দিন পরে নূতন পাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থী হইল। রূপে, গুণে ও অর্থে সে কালুর চেয়ে বিশেষ প্রকারেই ভালো।

কাজেই যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। পাত্রীর পিতা বাঁকিয়া বসিল। ছাগমাংস-লোলুপ ঈশপের সেই জনপ্রসিদ্ধ নেকড়ের মত মানুষেরও ছলের অভাব হয় না। নানা অজুহাতে বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু, কালু কিছুতেই আপন দাবী ত্যাগ করিতে চায় না। এই নিয়ে নানা গণ্ডগোল চলিতে লাগিল।

কালু গ্রাম্য সালিসের শরণাপন্ন হইল। সালিসের বিচারে সে জিতিল। কিন্তু হইলে কি হয়,প্রতিপক্ষ বলে, ও কৌশলে কালুর ভাবী বধূকে নিতে চায়।

বিষ্ণুশর্ম্মার বচনে যে আছে, যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা চতুষ্টয় যেখানে মিলিত হয়, সেখানে কি না অনর্থই ঘটিতে পারে, তাহা কাজিপাড়ার হারুর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সত্য।

নৌকা ক'রে বেড়াতে বেড়াতে স্নানার্থিনী ত্রয়োদশী মধুমালাকে দেখে সে আত্মহারাই হয়েছিল।

কাজেই নাছোড়বান্দা হারু এসে বলল—নূতন সালিশ চাই। আবার

সালিশ বসিল। সে সালিশদের অনেককেই টাকায় বশ ক'রে হারু জয়লাভ করিল। সেই সালিশীসভায় হারু ও কালুর যথেষ্ট বচসা হয়। বচসা প্রায় হাতাহাতির মতই হয়েছিল।

সেই দিন থেকেই হারুর উপর কালুর মহা আক্রোশ রহিয়া যায়।

ইহার পর মহাসমারোহে হারুর বিবাহ হইল। বিবাহের পর আপন জয়গর্ব্ব প্রকাশের জন্য নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া কালুর মাকে প্রণাম করিবার অছিলায় হারু যাইয়া ঝগড়া বাধায়। এ দৃশ্য কালুর পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল; তাহার পরে কলহ উপস্থিত হওয়ায় কালুর ধৈর্য্য রহিল না।

কালু ঝোঁকের মাথায় হাতের কাছের রাম-দা লইয়া হারুকে আঘাত করিল। সেই সবল বাহুর প্রাণপণ শক্তির আঘাতে হারু ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেল। হারুর নববধূ ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় বচসার আরম্ভেই পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, নইলে হয় ত তারও প্রাণরক্ষা হইত না।

এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী কালুর মা। পুলিসের নিকট কালু নিজের হত্যা-কাহিনী স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু পরে আইনের সাহায্য পাওয়ায় মোক্তারের উপদেশ-মতে সে সমস্তই অস্বীকার করিয়া বসিল। এই হত্যাকাণ্ড দিনে দুপুরে হইলেও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশেষ ছিল না; কাজেই মামলায় কি হইবে না হইবে, ভাবিয়া পুলিসের লোক বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল বর্ষীয়সী বিধবা,—বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে—আসামীর মুখ হইতে অস্ফুট স্বর বাহির হইল "মা"। জননী পুত্রের দিকে চাহিল; কান্নায় যেন তার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল।

জেরা চলিতে লাগিল।

প্রশ্ন।—এই আসামী কি সত্যই খুন করিয়াছে?

মাতা উত্তর দিল, "হাঁ।"

আমি আগ্রহে জননীর মুখের দিকে চাহিলাম। সেখানে তখন মানসিক দ্বন্দ্বের কাল-বৈশাখীর ঝড় বহিতেছিল।

মাতার স্নেহ ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে যেন ভীষণ লড়াই চলিতেছে।

"তুমি কি স্বচক্ষে খুন করতে দেখেছ?"

পুনরায় সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল, "হাঁ।"

"তুমি যা বলছ, তার ফল কি ভীষণ, তা কি জান?"

"জানি।"

"তোমার ছেলের ফাঁসী হবে, তা কি ভেবেছ?"

এবার নিদ্রিতা মাতা জাগিয়া উঠিল। বিধবা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হুজুর, রাগের মাথায় খুন করেছে, ওকে ক্ষমা করুন।"

হায় অন্ধ নারী, সে জানে না যে, আইন নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর।

পুনরায় জেরা চলিল।

"এখনও ঠিক ক'রে বল, পুলিসের লোক তোমায় ভয় দেখিয়ে এই সব কথা বলতে বলেছে—ঠিক কি না বল?"

"পুলিসের লোক, যা জানি, তাই বলতে বলেছে।"

"তা হ'লে তুমি মিথ্যা বলছ না?"

"না।"

"তোমার ছেলেই তা হ'লে খুনী?"

"হাঁ।"

আসামীর আর সহ্য হইল না—কোর্টের মধ্যেই চেঁচাইয়া উঠিল,"রাক্ষসী, তুই আমায় একটুও ভালবাসিস না।"

বেলা-শেষের পড়ন্ত রৌদ্র কোর্টের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছিল; সে আলো মায়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

কাঠগড়া হইতে নামিতে নামিতে মা বলিল, "তোকে যা ভালবাসি, বাবা, তার চেয়ে ধর্ম্মকে বেশী ভালবাসি। ধর্ম্মের চেয়ে বড় ত আর কিছু নেই।"

হাতের কলম ফেলিয়া সেই ছোটলোকের মেয়ের দিকে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আমার মনে হইল, যেন বেলাশেষের রৌদ্রে সে দিন এক নূতন জ্যোতিঃ জাগিয়া উঠিল।

নীরব নিস্পন্দ আদালত যেন অপরিচিত আবহাওয়ায় ভরিয়া উঠিল।

ঘোমটা-নিবারণী সভা

১

জটিল খুনী মামলার রায় লিখিতেছি। কি করিব ভাবিয়া পাই না, দ্বিধায় মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আকাশ পানে চাহিয়া তাই তর্কের ও যুক্তির থেই ঠিক করিতেছিলাম।

পদ-শব্দের ছন্দ চিন্তাকে ওলট-পালট করিয়া দিল। মল-পরা উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই এখন প্রিয়ার পায়ের চলার শব্দের সঙ্গীত মনে ধরিয়া রাখিতে হয়। মিথ্যা নহে, কবি দেবেন সেন, শ্যালী-যূথের মধ্য হইতে প্রিয়ার মলের ঝঙ্কার ধরিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, কাব্যামোদী পাঠকের তাহা বোধ হয় অজ্ঞাত নহে।

তবে আমরা পুরাতন কালের মানুষ, দেবেন সেনও পুরাতন কবি। যাক্, মহীপালের গীত গাহিয়া লাভ নাই।

ফিরিতেই দেখি, স্মিতাননা গৃহিণী মাথার ঘোমটা খুলিয়া স্যাণ্ডাল-জড়িত-চরণা হইয়া স্মিতাননে ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। হাস্য-মুখী হাস্য করিয়া বলিলেন, "কি পোড়া রায় হয়েছে, মুখ যে শুকিয়ে গেছে, একটু সরবত এনে দেব কি ?"

তরুণবয়সের আব্দার জড়িত আছে। শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। গৃহিণীর আদর অনেক মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। হয় গহনা, নয় ভ্রমণ, নয় কাপড়, নয় বিলাস-দ্রব্য—এমন করিয়া যত্নরক্ষিত ধনভাণ্ড শূন্য হইয়া যায়, তাই ত্রস্ত হইয়া বলিলাম, "না, তেষ্টা পায় নি।"

"ঐ দেখ, তোমায় কিছুতেই পারবার যো নেই, এক গ্লাস সরবত খেলে তোমার সঞ্চয় ফুরুবে না।"

ফুরাইবে না বুঝি, কিন্তু সরবতেই যদি শেষ হইত। নথির মাঝে পাশ-বইটি ছিল, সযত্নে সেটাকে কাগজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম।

দাম্পত্য-কলহে পুরুষ কখনও জেতে কি না, জানি না। বাহিরে সবাই বড়াই করেন, কিন্তু ভিতরে গেলে যে কেঁচো, এ খবর আমি ভালভাবেই জানি। অতএব সরবত আসিল।

সরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বিদায়-পালা গাহিতে চাই। বলিলাম, "তা দেখছ, বড় একটা জটিল রায়—তার পর বাহিরের ঘরে খালি মাথায়—"

বারুদে আগুন লাগিল। রণরঙ্গিণী স্বকীয় স্নেহ-দুর্জ্জয় প্রেম-ভীম মূর্ত্তি ধরিলেন।—"বুড়ো হ'তে গেলাম, দু'ছেলের মা হয়েছি, তবু তোমার শাসন! শুনছ, তোমাদের দাসত্বশৃঙ্খল আমরা ভাঙ্গছি।"

ভয় লাগিল, আজকালকার দিনে প্রাণ বজায় রাখাই মহা ফ্যাঁসাদ হইয়াছে। এ বলে কাটছি, ও বলে মারছি, কি যে করা যায়, ভাবিয়া পাই না। "সে কিরূপ, প্রকাশ করিয়া বলুন।"

সেকালের যাত্রা যাঁহারা দেখিয়াছেন, জানেন, কথা চলিতে চলিতে কোনও পাত্র বলিত, "প্রকাশ করিয়া বলুন।" বলা মাত্র ১০।১২ জন জুড়িদার লাফাইয়া উঠিয়া তারস্বরে প্রকাশ করিয়া বলিত। জুড়িদার না থাকিলেও গৃহিণীর গলার যে জোর আছে, আমাদের পড়শীরা তাহার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই দিবেন বলিয়া অনুমান করি।

"ঠাট্টা নয়, জান, লীলা-দি এসে এখানে এক নারী-সমিতি করেছেন—?"

"লীলা-দি কে ?"

"কেবল রায় লিখবে, জীবনের কোন খবরই রাখবে না।"

পরস্ত্রীর খবর রাখি না, ইহাতে দোষের কি, ভাবিয়া পাইলাম না। নব্য রুচির কথা জানি না, কিন্তু আমাদের যুগে পরস্ত্রীর নামও অশ্রাব্য ছিল। গৃহিণী বলিয়া চলিলেন—"তোমাদের যে জজ পাটনা হাইকোর্ট থেকে এখানে এসে বাসা করেছেন, তাঁর স্ত্রী।"

"গুণময়-দার পরিবার ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তাঁর কথা যদি শোন, তবে একেবারে তোমার চোখ ফুটবে।"

"এ বয়সে আর চোখ ফুটিয়ে কি লাভ হবে, গিন্নি ?"

"যাও! তোমার সঙ্গে যদি আর পারবার জো থাকে। অমন বিশ্রী সেকেলে ভাবে ডাকলে, সইরা যদি কেউ শোনে, তা হ'লে আমার মাথা কাটা যাবে।"

ভাল রে ভাল, নিজের পরিবারকে সম্বোধন করিব, তাহাও আবার কেঁচে গণ্ডূষ করিয়া শিখিতে হইবে! ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "কেন, কি দোষ হয়েছে?"

"তা যদি বুঝতে, তা হ'লে আমার কপালে এ দুঃখু আর হ'ত না।"

গৃহিণীর কপালে কি দুঃখ, ভগবান্ই জানেন। গহনা, কাপড় সেকেলে প্রেম, পুত্র, সংসার—সবই তাঁহার জল্জল্ করিতেছে, অথচ কিসের দুঃখ তাঁহার? অবশ্য বর্ত্তমানের প্রেম করিতে জানি না, কিন্তু গৃহিণীও সেকালের বউ।

"কেন, নাম ধ'রে ডাকলে ত পার। আমার কি একটি স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নেই?"

ভাবিতে হয়, আমাদের যুগে বি-এ ক্লাশে টেনিসনের Princess পড়ানো হইত, তখনই এই ধরণের কথা কিছু শুনিয়াছি। তার পর লোকমুখে শোনা যায়, এমনই কি কথা কোন নরওয়ের লেখক বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের আগল-দেওয়া ঘরে এ কি অচেনা ভূতের উপদ্রব!

"কিন্তু এ বয়সে আবার কেমন ক'রে পারি—এত দিন ধ'রে ওগো, হ্যাঁগো, গিন্নী, শুনছ, ক'রে কাটিয়েছি, তোমার নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি, এখন—"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আমরা কেমন ক'রে পারছি, এত দিন আমরা ঘোমটা প'রে বেড়িয়েছি, এখন কেমন ক'রে ঘোমটা খুলেছি?"

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিলাম—"সে কি!"

"আকাশ থেকে পড়লে যে, ঘোমটা ত হিন্দু সভ্যতার জিনিষ নয়, ওটা মুসলমানী আমলের দাসমনোভাব থেকে হয়েছে।"

গৃহিণী কবে যে গবেষক হইয়াছেন, জানি না। বলিলাম, "তা হ'লে যে জীবনের অর্দ্ধেক কাব্য মাঠে মারা যাবে। তোমাদের ওই আধ-দেখা আধ-না-দেখা রূপ নিয়ে এত দিন যে সব কবিতা-রচনা চলছিল, তার কি উপায় হবে?"

"ও সব ন্যকামীর যুগ চ'লে গেছে, বর্ত্তমানের যুগ উড়ন্ত যুগ—মানুষের উড়ো জাহাজ চলেছে নীল আকাশের বুক চিরে, মানুষের মনও সব সংস্কার ভেঙ্গে ছুটেছে।"

গৃহিণীর এই সব কাব্য নিশ্চয়ই শেখা বুলি, নচেৎ অনুকরণ, তথাপি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

সুন্দর সুষ্ঠু করিয়া বলিলাম—"দোহাই প্রিয়ে! এখন আর নূতনত্ব করতে পারব না, তোমায় বারণ করছি, সং সেজো না। ঘোমটার একটা আর্ট আছে, একটা বিউটি আছে।"

"যে নিজে কাপড় পরতে জানে না, তার কাছে আমায় আর্ট শিখতে হবে না, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। আমায় পাঁচটি টাকা দাও, ঘোমটা-নিবারণী সভায় চাঁদা দিতে হবে।"

যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই রাত্রি হয়। বক্তৃতা শোনা চলে, নেহাৎ খোলা-চুলে নিজের সম্মুখে দেখা চলে, কিন্তু টাকা? তবু দিতে হইল।

২

টাকার শোকে বৈকালে কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। রাস্তায় চলিতে চলিতে দেখিলাম, সত্যই নূতনত্ব, মেয়েদের সোজা সীঁতি বাঁকা হইয়াছে, সীমন্তের সিন্দুর-রেখা জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে, ঘোমটার জন্য যে কাপড়ের বহর, তাহা কাঁচলীতে পরিণত হইয়াছে।

রোজ বৈকালে শিরীষ-ফুলের ছায়ায় বসি। আজও বসিলাম। সর্ব্বেশ্বর দাদা দেখা দিলেন। দাদাকে বলিলাম, "দাদা! কলিযুগ যে আসছে, এখন উপায় ?"

"কি ভায়া! চিন্তাকুল হয়ো না, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হলেই গীতায় ভগবান্ বলছেন, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে।"

"না দাদা, তোমার রহস্য রাখ, আমার পাঁচ পাঁচটা নয়া টাকা বেরিয়ে গেছে।"

"তুই হাসালি নবীন, এ কথা আর কাউকে বলিস না। পাঁচটি টাকা বউ নিয়েছে, এতেই যেন তোর লাখ টাকা জলে গেছে।"

"কিন্তু দাদা, এ যে অপব্যয়, তার পর অনাচার, সমাজে বিশৃঙ্খলা, ভবিষ্যতে সমূহ বিপদ—"

"অবশ্য সেটা ভাববার বিষয়। আচ্ছা, এর খুব সহজ উপায় আছে, গুণময় দাদা যেরূপ নিরেট বুদ্ধির লোক, তাতে ভয়ের কারণ নেই, এমন ফন্দী খেলব যে, তোমার আতঙ্ক যাবে, অথচ কারও গায়ে আঁচড় লাগবে না।"

"এই ত চাই দাদা।"

শিরীষ-ফুল ঝরিয়া পড়িল। উৎসাহিত চিত্তে বলিলাম—"চল দাদা, আমার ওখানে এক কাপ চা খেয়ে যাবে।"

চায়ের নিমন্ত্রণ নিত্য মিলে না, কাযেই সর্ব্বেশ্বর দাদার আপত্তির হেতু নাই।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সর্ব্বেশ্বর দাদা বলিলেন, "লক্ষ্ণৌ কলেজে যে প্রিন্সিপাল হয়েছে, তার ছেলে না বিলাত থেকে Trjpos নিয়েছে ?"

"সুরেশের কথা বলছ, হাঁ, ছেলেটি সোনার চাঁদ, ওর বাপও কম বুদ্ধিমান্ নয়, আমাদের যুগে প্রেসিডেন্সীতে নরেশ রায়ের মত মেধাবী ছাত্র কেউ ছিল না।"

"নরেশের সঙ্গে তোমার জানা-শোনা আছে ?"

"আছে ব'লে আছে। সে যে আমার আত্মীয়, আমার শ্যালীর ছোট মেয়ের শ্বশুরের পিসেমশায় যে, সেবার এক মাস বিনা খরচায় ওঁর ওখানে চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় করা গেল হে।"

"বেশ বেশ, তা হলেই হবে। কিন্তু ভাই, জান, কার্য্যে মন্ত্রগুপ্তি চাই, চাণক্যের মত জান ত—ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ, অতএব যা বলছি, যা করছি, তা যেন কাউকে না, এমন কি, বৌদিকে পর্য্যন্ত বললে চলবে না।"

"ঐ যে ফ্যাসাদে ফেল্লে ভাই, সারাদিন মনের ভিতর যে সব কথা ভাষা না পেয়ে ক্ষুধাতুর কুকুরের মত জিব বাড়িয়ে থাকে, গৃহিণীর দেখা পেলেই দৌড়ে চ'লে আসে।"

"তবেই হয়েছে।"

"আচ্ছা ভাই, আমি ভয়ানক চেষ্টা কর্‌ব, এ কয়দিন না হয় অভিমান ক'রে থাকি, কি বল দাদা ? রাগবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

"কারণ ত আছে, কিন্তু শেষকালে না পস্তাতে হয়, তুমি যে আবার ঘরে ঢুকলে সব ভুলে যাও, তখন যে অপরের কথায় ওঠ-বস কর।"

"না না দাদা, কোন্ শালা আমায় স্ত্রৈণ বলে, অবশ্য একটু একটু স্নেহ করি বৈ কি, তা না করলে চলে কি—হাজার হোক নারী, সম্মান কর্‌তে হবে, তার পর আমরা শিক্ষিত, একটা ডিউটি বোধ আছে ত।"

"বেশ, তা হ'লে কাল সকালে গুণময় দাদার বাসায় যেতে হবে, তুমি তৈরী হয়ে থেকো, সেখানে যা করতে হবে, সব শিখিয়ে নেবো, একটু সকাল ক'রে উঠো।"

"কিন্তু দাদা, কাল যে আমার রায় দিতে হবে।"

"কাল না দিয়ে দুদিন পরে দেবে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, দুকূল রাখা চলে না ত।"

৩

গুণময় দাদা বলিলেন, "না ভাই, একটু মিষ্ট-মুখ করতে হবে। আমার ত চায়ের ব্যবস্থা নেই।"

সর্ব্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "বলেন কি দাদা, বৌদি বাংলাদেশে নবীনতার বাণী প্রচার করেছেন, আর আপনি—"

হাসিয়া দাদা উত্তর দিলেন, "ওতে আমার জুরিসডিকসান নেই। আজকালকার দিনে অধিকার ভাগ হয়েছে—তিনি থাকেন তাঁর মতে, আমি আমার মতে। এতে কোনও দুঃখ নেই।"

দুঃখ নাই বলিলে কি হয়। দুঃখধারা বক্ষে উছল হইয়া উঠে—কথাব ফাঁকি কি তাহা লুকাইতে পারে?

ভোজন ও কৌতুকালাপ শেষ হইলে সর্ব্বেশ্বর হঠাৎ বলিল, "দাদা, আপনার বড় মেয়ের বিয়ে দেবেন কি?"

"দিতে হবে বৈ কি, ওর মায়ের ইচ্ছায় এতকাল দেওয়া হয় নি, কিন্তু এখন প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছে, এখন লীলার আপত্তি নেই।"

"তা হ'লে ভালই হয়েছে, লক্ষ্ণৌ-বিদ্যাভবনের প্রিন্সিপাল নরেশ রায়ের সঙ্গে একটু হৃদ্যতা আছে, তাঁর ছেলেটি কেম্‌ব্রিজে কেমন নাম করেছে,

খবরের কাগজে দেখেছেন হয় ত। নরেশ ছেলেটির জন্য একটি সুপাত্রী খুঁজছে, তা আপনার কন্যা ললিতার সঙ্গে বেশ মানাবে।"

গুণময় দাদা উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "তা আর জানি না, এ হ'লে ত আমার ভাগ্য বলতে হবে। তা এ বিষয়ে তোমার বৌদির মতামত—"

"তা নিতে হবে বৈ কি, তিনিই ত হলেন আসল।"

দাদা বলিলেন, "বেয়ারা! মেম সাহেবকে ডাক।"

দাদার নিজের সীমানায় বাহুল্য ও বিলাস নাই। পত্নীর গণ্ডী পড়িলেই বিলাতী কানুন, দোটানায় জীবন কেমন চলে কে জানে!

খানিক পরে বৌদি আসিলেন। উঁচু গোড়ালি দেওয়া জুতার মসমস ধ্বনি চকিত করিয়া তুলে। পরনে মাদ্রাজী নক্‌শাকাটা শাড়ী, পশ্চিনাদের মত কাঁচলী করিয়া পরা, মস্তক অবগুণ্ঠনশূন্য, পিছনের খোঁপা জাপানী কি ফরাসী ধরণে বাঁধা, তাহা জানিতে হইলে গৃহিণীর সাহায্যের প্রয়োজন কিন্তু তাঁহাকে এ লেখা দেখানো চলে না, অতএব বর্ণনা অসম্পূর্ণ রাখিতে হইল।

পরিণত বয়সেও রাজরাজেশ্বরীর মত রূপ, নূতন ঢঙেও বৌদিকে মহীয়সী দেখাইতেছিল। দাদা বলিলেন, "ললিতার একটি সম্বন্ধ এসেছে।"

"কিন্তু বি-এ পাশ করার পর বিয়ে দিলে মন্দ হ'ত না।"

"তা ভেবে দেখ, ভাল মন্দ সব সময় মিলে না।"

সর্ব্বেশ্বর দাদা ঘটকালিতে মজবুত। বাক্যবিন্যাসে বরের ও বরকুলের এমন প্রশংসা আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে যে কোনও কন্যার পিতা বা মাতা আবদ্ধ না হইয়া পারে না। তখন পাত্র-বিনিময়ের সম্মতি লইয়া সর্ব্বেশ্বর বলিলেন, "চল ভাই।"

আমি প্রায় কাষ্ঠ-পুতুলের মত বসিয়াছিলাম। নমস্কার জানাইয়া উঠিলাম। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সর্ব্বেশ্বর বলিল, "ভাল কথা, গোড়ায় গলদ হয়েছে, বৌদি, আপনার ও আপনার কন্যার দুখানি ফটো না দিলে ত হচ্ছে না, শূন্যে ত আর প্রাসাদ গড়া চলবে না।"

গুণময় দাদা অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তোমার বৌদির ফটো নিয়ে কি করবে?"

সর্ব্বেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,"বৌদি যদি অভয় দেন ত বলি, কথায় বলে কি না, যেমন মা, তেমন ছা—এই জন্যে অনেকে শুধু মেয়ের ফটো দেখেই ভুলেন না, ভাবী বেয়াই ভাবী বেয়ানের রূপ-গুণের পরখ ক'রে নেন।"

সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। লীলা বৌদি রাগত-ভাবে বলিলেন, "এ কি ছেলেমি করছেন আপনি।"

"না বৌদি, মোটেই ফাজলিমি নয়, ঘটকালী ব্যবসাটা অনেক করতে হয়েছে, অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে খেয়ে অনেক শিক্ষা হয়েছে।"

"অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই। আমি ত চাই—নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে জগতে দাঁড়াক, লজ্জা ও সরমের বাধা যেন তার অন্তরায় না হয়।"

সর্ব্বেশ্বর বলিল, "বৌদি, এ বক্তৃতা গিন্নীর কাছে করবেন, বক্তিমা আমি সইতে পারি না।"

গুণময় দাদার মুখে হাসির লহর খেলিয়া গেল। আমরা পুনরায় নমস্কার জানাইয়া বলিলাম, "আজ তবে আসি।"

দাদা প্রত্যুদ্গমন করিয়া দ্বারপ্রান্তে আসিলেন, তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই নবীন, তুমিও একটু মনোযোগ করো, তোমার ত আত্মীয়।"

আমি চলিতে চলিতে বলিলাম, "তা করব বৈ কি, নরেশ বাবু আমাকে বিশেষ ভালবাসেন।"

৪

পক্ষখানেক পরের কথা।

এবার বৌদির খাস-কামরায় মজলিস বসিল। ঘটকের সমাদর বাড়িয়া চলিয়াছে। চায়ের ও সঙ্গীতের আপ্যায়ন শেষে বৌদি বলিলেন, "তার পর চিঠি পেলেন?"

সর্ব্বেশ্বর দাদা গুণময় দাদার দিকে একবার, বৌদির দিকে একবার চাহিয়া বলিল,—"ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?"

গুণময় দাদা ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

কালোমুখ করিয়া সর্ব্বেশ্বর দুঃখিত-চিত্তে উত্তর দিলেন, "আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে, আজ যত মিষ্টান্ন পেটে গিয়েছে, তার চেয়ে বেশী অভি-সম্পাত বরাতে আছে।"

বৌদি এবার উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "ভণিতা করবেন না, বলুন, কি হয়েছে।"

আমি বলিলাম, "চিঠিটা একটু অপ্রিয়, তাই সর্ব্বেশ্বর দাদা ইতস্ততঃ করছেন।"

বৌদি এবার সত্যই রাগিয়া বলিলেন, "প্রিয় হ'ক আর অপ্রিয় হ'ক, আপনাদের ত কোন দোষ নেই, বলুন না, কি উত্তর পেলেন?"

সর্ব্বেশ্বর দাদা বলিলেন, "খবর যে ঠিক অনিশ্চিত, তা নয়, তবে কিছু কিন্তু আছে, আমি হয় ত সব ঠিক ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারব না, তার চেয়ে চিঠিটা পড়ি। কি বলেন?"

শ্রোতাদের ধৈর্য্য সহিতেছিল না। গুণময় দাদা বলিলেন, "হাঁ, সেই ভাল, চিঠিটাই প'ড়ে শোনান।"

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন, "অবান্তর কুশলপ্রশ্ন ও মামুলি কথা বাদ দিয়ে পড়ি।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তাই পড়।"

সর্ব্বেশ্বর পড়িতে লাগিলেন—"ভাই সর্ব্বেশ্বর, তুমি যে সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করেছ, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাহা যোগ্য ও শোভন মনে করি। কিন্তু কিছু বাধা আছে, তাহা তোমাকে না জানালে প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হবে। আমার পুত্র বিলাত গেলেও তার শিক্ষা ও সহবতের মধ্যে আমাদের বাড়ীর শক্ত বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে। আজকালকার যুগে যে বিবিয়ানা আমাদের নিজস্ব সুরকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, সুরেশ তাকে কখনই বরদাস্ত করবে না। ভাবী বৈবাহিকা ঠাকুরাণীর কীর্ত্তিকলাপ কিছু কিছু কাগজে দেখেছি, তোমার প্রেরিত ছবিতে তার পূর্ণ পরিচয় পেলাম। তাঁর আদর্শ ভাল ব'লে আমরা মনে করি না, ঘোমটা ত্যাগ করলেই যে নারী বিজয়িনী হবে, এ ধারণা আমার নেই, মনের কৃষ্টির দিকে নজর না দিয়ে বিলাস ও ব্যসনের সাজ ও সজ্জার চমক লাগাইলে নারীর গৌরব বাড়বে না।

আমার মা বেঁচে আছেন। তিনি আপন নাতবৌকে সেকালের বরবর্ণিনী বধূর মতই দেখতে চাইবেন। মায়ের প্রতি ভক্তি হয় ত আমাদের দৃষ্টিকে একটু সেকেলে করেছে। উজ্জ্বল সিন্দুররাগরঞ্জিত সীমন্ত, শঙ্খবলয়-শোভিত দুখানি পদ্মহস্ত, অবগুণ্ঠন-মধুর নববধূর সুষমাই আমাদের মনের কাছে পরম রমনীয় ব'লে মনে হয়। কাযেই ভাবী বৈবাহিকার বিবিয়ানার আবছায়ায় লালিত কন্যার সিন্দুরশূন্য বাঁকা সীঁথি,

শাঁখাহীন হাত, আর ঘোমটা-হীন বেহায়া চলন আমাদের পরিবারে মোটেই খাপ খাবে না। গুণময় বাবুর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর সহিত আত্মীয়তা হ'লে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ হ'ত, তা ভাষায় বলা চলে না। কিন্তু মন যেখানে মিশবে না, সেখানে মিলন যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব আমায় ক্ষমা করবে।"

বৌদি থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Hang your letter. বিংশ শতাব্দীতে থেকেও যারা মধ্যযুগের বর্ব্বরতা চায়, তাদের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই না।"

গুণময় বাবু আপশোষ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু এমন সম্বন্ধ কি সহজে মিলবে ?"

"না মিলে, মেয়ে আইবুড়ো থাকবে, মেয়েদের চলনকে যারা বেহায়া বলতে পারে, তাদের chivalry বুঝা যাচ্ছে।"

ঝঙ্কার থামিলে বলিলাম, "বৌদি ! ও কথাটা ওখানে শ্লেষ হয়ে ব্যবহার হয়েছে। ওর সদর্থ ক'রে নিলে কোনই দূষ্য নেই।"

"কিন্তু তবু এমনই একটা ইতর কথা—"

সর্ব্বেশ্বর বাধা দিলেন, "বৌদি, মাফ করবেন। কিন্তু লেখাটা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই, এটা যে আমি বেকুবি ক'রে আপনাদের মত উচ্চমনা শ্রদ্ধেয়া মহিলাদের সম্মুখে পাঠ করব, লেখক তা জানতেন না।"

"জানুন আর নাই জানুন, আমাদের দেশের বেইমান পুরুষদের শেখা উচিত, নারীদের সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কইতে হয়। এবার সভায় আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রস্তাব ক'রে Bengal Councilকে move করাচ্ছি।"

আহতা সর্পিণীর বিষোদ্গারের পাশে থাকা শ্রেয় ও সুবিধার নহে বলিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

সর্ব্বেশ্বর দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা, একবার বিবেচনা করবেন, এমন একটা পাত্র হাজারে মিলে না। বৌদিও শান্ত হয়ে ভেবে চিন্তে দেখুন।"

নিরাশচিত্তে হতাশ সুরে গুণময় দাদা উত্তর দিলেন, "সে ভাগ্য কি হবে আমার! তবে বিবেচনা করেই দেখব।"

বৌদির স্নেহ-সুকঠোর শাসনের মাঝে বেচারী দাদাকে একলা ফেলিয়া পলাইতে কেমন বাধ-বাধ লাগিতেছিল, কিন্তু গত্যন্তর নাই দেখিয়া চম্পট দিতে হইল।

৫

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ কড়িকাঠ গুণিলাম। গৃহিণীর দেখা মিলে না, তাঁর মহিলা-সমিতির অধিবেশন। মটর ভাড়া ২ টাকা, একা একা আহার, দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা—এতগুলি symptoms, হানিম্যানএর কোন সস্তা ঔষধ লেখে নাই।

কেমন করিয়াই বা লেখে, তখনকার যুগে হয় ত এ সব উপদ্রব ছিল না। কেবলমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছে। কাণে ডাক লাগিল, "ওগো, এর মধ্যেই ঘুমিয়েছ?"

চুপ করিয়া থাকিলাম। আমার নিরুত্তর দেখিয়া গৃহিণীর পিত্ত জ্বলিল কি চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল, কে জানে। বলিলেন, "কি যে পোড়া ঘুম, কথা কইছ না যে?"

আমি বলিলাম, "'ওগো' ব'লে ডাকলে আমি কথা কইব না।"

"তবে কি বলতে হবে, প্রাণকান্ত নবীন?"

সত্যই রাগ হইল, পতিদেবতার এই অপমান ধরিত্রী কেমন করিয়া সহে? রামায়ণের যুগে দ্বিধা হওয়ার কথা কি নেহাৎ গল্প?

বলিলাম, "ডিয়ার কি ডার্লিং বলতেও ত পার।"

"হয়েছে, তোমার ঝগড়া রাখ, মজার খবর আছে, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।"

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, "কি হয়েছে?"

গৃহিণী ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "ঘোমটা-নিবারণী সভায় যবনিকা পড়েছে। লীলাদি আজ গভীর দুঃখে জানিয়েছেন যে, এই অকৃতজ্ঞ দেশে কোনও কাজ করবেন না, তিনি সভানেত্রীর পদ থেকে অবসর নিলেন।"

"তাতে আর কি হয়েছে, কেন পোড়া লোকেরা কি তোমার যোগ্যতা চিনলে না? তুমি থাকতে—"

"নাও, নাও, আর রহস্য করতে হবে না। সভানেত্রীর শুধু যোগ্যতা থাকলেই চলে না, তাঁকেই সমস্ত খরচপত্র বহন করতে হয়, তুমি কি আমাকে তা দিতে?"

যাক, বাঁচা গেল, নিজের খনিত গর্ত্তে নিজেই পড়িয়াছিলাম।

পরদিন সর্ব্বেশ্বর দাদাকে বলিলাম, "কৌতুক ত শেষ হয়েছে, এখন আসল ঘটকালীটা করতে হয়।"

"কুচ পরোয়া নাই, হামভি করেঙ্গা।"

দাদার নির্ভয়োক্তি প্রীত করিয়া তুলিল। দাদার বুদ্ধিটা শাণিত ছুরিকার মত, কোথাও তাহার আটকায় না। প্রলোভনের সে সব ফাতনা ফেলিয়া দাদা মৎস্য গাঁথিতে বসিলেন, তাহাতে কোন মৎস্যই না ভুলিয়া পারে না। নরেশ বঁড়শী গিলিল।

তার পর শুভদিনে শুভক্ষণে মহা সমারোহে পরিণয় হইয়া গেল। ধুমধাম ও আনন্দের বাহুল্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়া তুলিল। পরিণয়শেষে নরেশ বাবু, গুণময় দাদা, সর্ব্বেশ্বর, আমি ও আরও কয়েক জন শেষ ভোজনে বসিয়াছিলাম।

গভীর তৃপ্তিতে গুণময় দাদা বলিলেন, "বলিহারি যাই, বেহাই। তোমার চিঠিটা যে কাজ করেছে, তা জীবনে ভুলবার নয়। মায়ের স্নেহ যে কত গভীর, তার পরিচয় পাওয়া গেছে, ভাই! কন্যার প্রতি গভীর মমতায় তোমার বেয়ান নিজের খেয়াল একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়েছেন।"

নরেশ বাবু বিস্মিত-দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন, "কি বলছেন বেয়াই!'

গুণময় দাদা বলিলেন, "আপনার সেই চিঠিটার কথা বলছি। ওটাকে সোনার জলে বাঁধিয়ে আমার ঘরে রাখতে হবে, বুড়া বয়সে ঝগড়া ক'রে কি পোষায় ভাই।"

নরেশ বাবু বলিলেন, "কৈ, আমি এমন কি চিঠি লিখলাম।"

সর্ব্বেশ্বর ভোজনে প্রমত্ত ছিলেন। দিস্তা খানেক লুচি, সের দুয়েক মাংস অন্যান্য উপরণসহ উদর-দেবতায় দিয়াও দাদার তৃপ্তি হয় নাই। দাদা এইবার মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করতে হবে দাদা, চিঠিটাই একেবারে জাল।"

গুণময় দাদা হাসিয়া বলিলেন, "সে কি বলছ?"

সর্ব্বেশ্বর দাদা হাসিয়া উত্তর দিলেন "ও নিয়ে আর তর্ক আলোচনা ক'রে লাভ নেই, ওটাকে সেক্ষপীয়রের ভাষায় মনে করুন, না হয় 'নিদাঘ-নিশীথের স্বপন'।"

মায়ের প্রাণ

১

"ঘুমুলেন না কি ?"

বাহিরে তখন বর্ষা পড়িতেছিল—ঝুপ ঝুপ ঝুপ। মেঘস্তরের কালিমার মত জমাট তিমির-স্তর চারিদিক্ জুড়িয়া নিয়াছিল। তাই পড়া বন্ধ করিয়া প্রদীপের সলিতাটি নিস্তেজ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র শুইয়াছি, এমন সময়ে রণজিৎ ডাকিল—"ঘুমুলেন না কি ?"

নিশীথরাত্রির যে নিস্তব্ধতা মানুষকে তন্দ্রালস ক'রে তোলে, বর্ষার এই অবিরাম জলোচ্ছ্বাসে তেমনি একটা আলস্য আমায় যেন পেয়ে বসিতেছিল। কিন্তু রণজিতের ডাকের উত্তর না দেওয়া আমার চলে না, তাই আলস্য

ভাঙ্গিয়া বলিলাম—একটু হাস্য-চটুল স্বরে, "কি, ডাকছেন কেন? আজ মেঘৈর্মেদুর-অন্তরে আপনার ভাবী প্রেয়সীর মুখচ্ছবি মনে জাগছে কি?"

রণজিৎ ছিল চঞ্চল ও হাস্য-লাস্য-প্রিয়, কিন্তু আমার রসিকতায় অন্য দিনের মত উল্লসিত হইয়া উঠিল না, কিংবা আমাকে তাহার বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল না; বরং মুখে অনেকটা গাম্ভীর্য্য আনিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"যতীশ বাবু, আপনি ভালবাসার নিষ্ঠাকে কি মনে করেন?"

এ কি প্রশ্ন! সরল ও সাধারণ মানুষের মত যাহার কথা রোজ শুনিতেছি, তাহার এই গম্ভীর হেঁয়ালি-ভরা কথা শুনিয়া আমি প্রথমে একটু অবাক্ হইলাম, কিন্তু পরক্ষণে মনে করিলাম যে, হয় ত রণজিতের নূতন কোন কৌতুকের অবতারণা মাত্র। তাই বলিলাম—"কি, কোনও romance আরম্ভ কর্বেন না কি?"

গাঢ়কণ্ঠে সে উত্তর করিল—"না, এটা romance নয়, আবার romance-ও বটে, সাধারণ রাজপথে যদি সাত রাজার ধন মাণিক কেহ কুড়াইয়া পায়, তবে সে কেউ সত্য ব'লে মনে করে না—নিন্, তেমনি একটা মাণিক আজ আপনাকে দিচ্ছি।" এই বলিয়া একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত থলিয়া আমার বিছানায় ফেলিয়া দিল। উঠিয়া বসিয়া সলিতা উস্কাইয়া দিয়া দেখিলাম—থলিয়ায় একটি আকবরী মোহর। এবার সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম, আপন মনেই বলিলাম—"এ কি!"

রণজিৎ আমার মুখের পানে দৃঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"দেখুন যতীশবাবু...সংসারে যে অন্যায়ের রাজ্য চলেছে, তা নয়—এখানে ভালবাসা, স্নেহ ও মায়া স্বর্গের সুধা বিলিয়ে দিচ্ছে।"

রণজিতের বক্তৃতাপ্রিয় কণ্ঠকে থামাইয়া বলিলাম—"অবশ্য আপনার কথা মানলুম, কিন্তু সোনা কেউ লুটিয়ে দিচ্ছে না, এটা আপনি কোথায় পেলেন ?"

"বলছি, কিন্তু আপনি এ নিয়ে কোন কথাই বলতে পারবেন না—যে ভালবাসার গভীরতা আপনি বুঝতে পাবেন না—তাকে কখনও অপমান করবেন না,"—এই বলিয়া রণজিৎ প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

"এ কি হেঁয়ালি, আমি বুঝতে পারছি না।"

"শুনুন, ওই মোহরটি মাসীমা আপনাকে দিয়েছেন—তাঁর যে ছেলেটি মারা গিয়েছিল, তারও নাম যতীশ ছিল কি না ? থাক্—এইবার ঘুমিয়ে পড়ুন, রাত হয়ে গিয়েছে।"

সে পাশ ফিরিয়া শুইল। আমি অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলাম না, আমার তন্দ্রাহীন চক্ষে একটি মহীয়সী নারীমূর্ত্তি কেবলি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে তখনও বর্ষা তাহার রিমঝিম ছন্দে নাচিতেছিল।

২

আমার বাড়ী ছিল অজ পাঁড়াগায়ে। যখনকার কথা বলিতেছি, তখনও সেখানে সভ্যতার কোন আলোকই পড়ে নাই। পড়াশুনা করিবার জন্য আমাকে বাইরে যেতে হয়।

যে পরিবারে আমার থাকা হয়, সে পরিবার বেশ সঙ্গতিপন্ন। জমিদার না হইলেও বেশ অবস্থাপন্ন। রণজিৎও ঐ বাড়ীতেই থাকিয়া পড়িত, বাড়ীর কর্ত্তা রণজিতের দূর-সম্পর্কীয় মেসো মহাশয় ছিলেন। রণজিৎ ও

আমি এক ঘরে থাকিতাম ও একসঙ্গেই পড়াশুনা করিতাম। রণজিতের মাসীমা ছিলেন গৃহের গৃহিণী, কাজেই রণজিতের সর্ব্বত্র অবাধ গতি ছিল। আর তার উপর রণজিৎ ছিল আমুদে লোক। সে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিত ও সকলের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারিত। আমি বরাবরই লাজুক, তার উপর আশ্রয়প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনও দাবী আমার ছিল না, তাই আমি বেশ সঙ্কোচেই চলিতাম। সংসারে অনেক লোকের খাওয়া-দাওয়া চলিত, বাড়ীটা নানাপ্রকার লোকে সর্ব্বদাই গম-গম করিত, তাই মেয়েদের দ্বারা রান্নার কাজ চলিত না। বাড়ীতে ঠাকুর ছিল, কাজেই মেয়েমহলের সহিত পরিচিত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

নানা রকম আদব-কায়দার পর্দ্দার আড়ালেও যে মানুষের দুখানি মঙ্গলহস্তের কাজ থাকিতে পারে, তাহা আমি কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলাম। রণজিৎ ও আমি সমবয়স্ক হইলেও আমি উপরে পড়িতাম আর আমাকে সকাল সকাল খেয়েই পড়িতে যাইতে হইত। আমি যখন সকালে খাইতে যাইতাম, তখন রান্না অর্দ্ধেক হইয়া উঠিত না,—কাজেই আলুভাতে ভাত ও ডাল কিংবা একটা তরকারি খাইয়াই আমায় যাইতে হইত। আমরা সবাই দুধ পাইতাম না, কিন্তু কর্ত্তার আদেশ ছিল, যেন সকালে আমাকে দুধ দেওয়া হয়, এ আদেশ কার্য্যে পরিণত হওয়া দুষ্কর ছিল ; কারণ, বেলা ৯টার মধ্যে ঠাকুর এ সব কাজ করিয়া উঠিতে পারিত না।

আমার যাওয়ার মাসখানেক পরে একদিন সকালে খাইতে বসিয়াছি। সে দিন ঠাকুর ডাল-ভাত দিয়া গিয়াছিল—অর্দ্ধেক ভাত ক্ষুধার্ত্ত উদরে প্রেরণ করিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর, আর কিছু হয়েছে ?"

রান্নাঘরের ভিতর হইতে ঠাকুর উত্তর করিল, "না বাবু, আজ আর কিছু রান্না হয় নি, ডাল দেবো কি আর একটু ?"

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতে কোমল কণ্ঠে কে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি দিয়েছ ঠাকুর ?"

ঠাকুর বলিল—"শুধু ডাল।"

"দুধ জ্বাল দেওয়া হয় নি ?"

"না মা, এখনও হয় নি।"

"ঠাকুর, তুমি ওঁকে বসতে বল, আমি দুধ জ্বাল দিয়ে দিচ্ছি।"

সে দিন দুধ দিয়ে খেতে হ'ল। কিন্তু দুধের চেয়ে সে দিন মিষ্ট যা লেগেছিল, তাহা অন্তরালবর্ত্তিনী এই নারীর স্নেহ-সুকোমল সহানুভূতি। অনেকখানি আনন্দে সে দিন পড়িতে গেলাম। সমস্ত দিনটা আমার নিকট মধুময় বোধ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল যে, এই বিপুল গৃহে বহুজনপ্রাণীর মধ্যে এক জনও অন্ততঃ আমায় ভালবাসে—আর সে নারী। শৈশবে ও কৈশোরে আমাদের চিত্ত মেয়েদের এই অজস্র স্ফুরিত ভালবাসার জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষিত থাকে, তাই আজিকার এই অপরিচিতার ভালবাসাটি আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

রাত্রিবেলায় পড়িতে বসিয়া রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কে এসেছেন রে ?"

'কে আবার আসবে ? কেন তা জিজ্ঞাসা করছেন ?'

রণজিৎ ও আমার ভালবাসা ঐ এক ধরণের ছিল। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়াও—আপনি আপনি বলা ছাড়ি নাই। নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত হইলেও আমাদের মধ্যে কোথাও হয় ত একটুকু ফাঁক

ছিল। "না, অমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম, আজ খাওয়ার সময় রান্নাঘরে কে এক জন এসেছিলেন, আমায় দুধ জ্বাল দিয়ে খেতে দিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"ওঃ, তাই বলুন, ও নিশ্চয়ই রাঙ্গা মাসীমা। তিনি বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন কি না, সবে কাল ফিরেছেন। রাঙ্গা মাসীমা না হ'লে আর পরের জন্য প্রাণ পুড়বে কার? এ বাড়ীর আর সবাই দেখুন গে তাস খেলছে, নয় গল্পগুজব করছে, কিন্তু যেখানে দরকার, সেই-খানেই রাঙ্গা মাসীমা। লোকে জানছে না, তবুও তিনি কাজ ক'রে যাচ্ছেন, কিন্তু তা হ'লে কি হয়, সবাই রাঙ্গা মাসীমাকে চেপে রেখেছে। এ সংসারে তাঁর কোন কথা বলবার যো নাই—এক নিশ্বাসে এত পরিচয় দিয়া রণজিৎ থামিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার রাঙ্গা মাসীমার ছেলে-মেয়ে কটি?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন, এ জগতে যে ভাল, ভগবান্ তারই সর্ব্বনাশ করেন, মেসোমহাশয় ত এক ছেলে রেখে মারা যান, সে ছেলে দশ বছরের হয়ে মারা গেছে।"

আনন্দ-উজ্জ্বল সেই অনভিজ্ঞ হৃদয়ে তখন বড় একটা চমক লাগিল। রণজিতের কথায় কোন উত্তর করিলাম না, পুনরায় বই খুলিয়া বসিলাম। কিন্তু সে দিন অক্ষরগুলি যেন আমার চোখে ঝাপসা হইয়া যাইতেছিল।

৩

তার পর প্রতিদিন এই স্নেহময়ীর স্নেহ-হস্তের পরিচয় পাইতাম। রোজ ঠাকুরের দুতিন ভাগ রান্না পাইতাম, দুধের বাটি সরে ভরা থাকিত, মিষ্টান্ন আসিলে ভাগের ভাগ হইতে আর বঞ্চিত হইতাম না। এই কল্যাণীকে

এক দিন দেখিলাম। সে দিন ঠাকুরের রান্না শুধু ভাত আর ডাল হইয়াছিল, বাজার হইতে দুধ পৌঁছায় নি। ডাল শেষ করিয়া পুনরায় ডাল চাহিব, এমন সময় শুভ্রবাস প্রভাতের আলোর মত স্নিগ্ধ-সুন্দররূপে অন্নপূর্ণার বেশে তিনি আসিলেন। হাতে তাঁর নিরামিষ তরকারি। আমি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, জননীর মত প্রভাময়ী দেবী তিনি। আমার অন্তর এই দেবীর চরণে আপনি লুটাইয়া পড়িল, আমার সমস্ত ক্ষুধিত চিত্ত ডাকিল—'মা মা'! কিন্তু সে বাড়ীর ধারার আড়াল দিয়ে ঘেরা বেড়া, তাহা কেহই ভাঙ্গিতে পারিলাম না—না আমি, না তিনি। ইহার পর প্রায়ই নিরামিষ রান্নার 'প্রসাদ' পাইতাম। আমার মনে হইত, দরজার পাশে কাহারও স্নেহ-চক্ষু যেন চাহিয়া রহিয়াছে।

মাঝে এক দিন রণজিৎ আমাকে বলিল—"দেখুন যতীশ বাবু, একটা মজার কথা—শুন্‌লে হয় ত আপনার হাসি পাবে, কিন্তু হাসবেন না?"

"হাসবার কথা হ'লে হাসতেই হবে, তাতে ত কান্না চলবে না।"

"চলে বৈ কি, খুব চলে—জীবনের রহস্য কি জটিল—কখন্ আনন্দ যে দুঃখে পর্য্যবসিত হয়, কে বল্‌তে পারে?"

তাহার বক্তৃতা হয় ত চলিত। কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—"তার পর কি বলছিলেন?"

"হ্যাঁ, বলছিলাম কি, মাসীমা আজ বলছিলেন যে, আপনার মুখের চেহারা আর তাঁর সেই মরা ছেলের মুখের চেহারা নাকি দেখতে একরকম—হাঃ হাঃ! মাসীমার কি বোকামি" এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, তাহার কথাই সত্য ছিল, এ কথা শুনিয়া আমি হাসিব কি কাঁদিব, স্থির করিতে

পারিলাম না। আমি শুধু অকারণে গম্ভীর হইয়া উঠিলাম। রণজিৎ তাই চুপ করিয়া রহিল।

খানিক পরে ভাবিলাম, এটা হয় ত রণজিতের মিথ্যা কথা, কিন্তু তাহা নয়। তাঁহার ব্যবহারে আমার স্পষ্টই জানা ছিল যে, তিনি আমায় বিশেষ ক'রে ও বেশী করেই ভালবেসে ফেলেছেন। এই ভালবাসা প্রকাশ পায় নি কেবল রণজিৎ যাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। রণজিৎ ব্যতীত কাকপক্ষী এই উদ্দাম স্নেহধারার কথা জানিত না।

এই ভালবাসার জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে অপদস্থ ও তিরস্কৃত হইতে শুনিয়াছি। নিঃসন্তান এই বিধবা বধূটি তাঁহার অতৃপ্ত সমস্ত পুত্রস্নেহে আমাকে ভালবাসিয়াছিলেন। এ স্নেহ ও প্রীতি অসীম মাধুর্য্যে ভরা, তাই আমি নিতে অবসন্ন হয় নি, কিংবা তিনি দিতে কাতর হন নি। তবে রণজিৎ যখন তার লাঞ্ছনার কথা আমায় আসিয়া বলিত, তখন আমার অন্তর বেদনায় গুমরিয়া উঠিত। হায় ও গো অক্ষম জননি! যেখানে তোমার ক্ষমতা নাই, সেখানে শুধু অন্তরের ভালবাসা দিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে পার না কেন? সে দিন বাড়ীতে সন্দেশ এসেছিল, তিনি একে-বারে আমাকে ৪টি সন্দেশ দিয়ে ফেললেন। রণজিতের নিকট শুনিলাম, ইহার জন্য তাঁহাকে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল।

এই স্নেহ শুধু আমরা উভয়ে অন্তর দিয়া জানিতাম, বাক্য কখনও এ ভালবাসাকে প্রকট করে নাই। শুধু ভালবাসার সেই নির্ভুল সাক্ষী সোনার মোহরটি পেয়েছিলাম। প্রথমে আমি মোহর লইতে চাহি নাই, রণজিৎ তাহার রাঙ্গা মাসীমাকে এ কথা বলিয়া দিয়াছিল! সে দিন ভাত খেতে এলে তিনি নিত্যকার মত আমায় নিরামিষ পরিবেশন করিতে

আসিলেন, তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু সজল, মুখ বেদনায় ম্লান। এই মৌন সঙ্কেত আমি কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি মোহরটি লইলাম। পবিত্র ভালবাসার ও মাতৃস্নেহের এই স্মৃতি আমি চিরদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়াছি।

ইহার কিছুদিন পরেই সেখানকার পড়া আমার শেষ হইয়া যায়। কাজেই এই কল্যাণী জননীর ভালবাসা পিছনে ফেলিয়া, রণজিতের হাস্য-লাস্য ভুলিয়া আমাকে নূতন দিকে নূতন দেশে ছুটিতে হইল। জীবনযাত্রার এই চালটা কবির নিকট প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু আমাকে সে বড়ই বেদনা দেয়। যেখানে এক দিন কত যত্নে, কত স্নেহে, কত মমতায় জীবনের নীড় তুলিয়াছিলাম, সেখানের সে নীড় ভাঙ্গিতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়।

সেই স্নেহ-নীড় ভেঙ্গে যাওয়ার পর অনেক দিন চ'লে গেছে। ওকালতি পাশ ক'রে পুলিশ কোর্টের কড়িকাঠ গোণাই আমার ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে দিনও সামলা পরিয়া শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় দেখি, রণজিৎ বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতির মস্ত একটা বোঝা বহিয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিয়াই সে ছুটিয়া আসিল। তার পর আমার হাত ধরিয়া পূর্ব্বের মত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "কেমন আছেন যতীশ বাবু?"

"এক রকম চলছে। তারপর আপনার কি খবর?"

"আপনি ত আমাদের ভুলে গেছেন, আমাদের খবর শুনে আপনার কি লাভ?" অভিমানে তাহার স্বর ফুলিয়া উঠিতেছিল। আমি সে

কথার কি উত্তর করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। কঠোর জীবন-সংগ্রাম, অন্ন-সমস্যা প্রভৃতি বড় বড় কারণগুলির সম্বন্ধে দুকথা বলিয়া রণজিৎকে নির্ব্বাক্ করিয়া দিব ভাবিলাম, কিন্তু মুখে আমার কথা সরিল না। রণজিতের কথায় অতীত জীবনের একটি দিব্য আনন্দময় ছবি আমার মনে জাগিতে লাগিল।

রণজিৎ তখন আরম্ভ করিল, "দেখুন,—আপনি ভুলতে পারেন, কিন্তু আমরা ভুলি নাই। 'রাঙ্গা' মাসীমা মর-মর, আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। আজ চার পাঁচ দিন খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে আপনার বাসার সন্ধান পেয়েছি, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

রণজিতেরও যেন কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তার রসিকতা, শ্লেষ যেন কঠোর ধরণীর কঠোরতায় একেবারে উবিয়া গেছে।

"তিনি কোথায় আছেন?"

রণজিৎ আমায় বাড়ীর ঠিকানা দিল ও তার সঙ্গে সঙ্গে দুচারিটা মিষ্ট মধুর গালি দিয়া বিদায় লইল। যাওয়ার সময় রণজিৎ একটু জোরের সহিত বলিয়া গেল—"যদি মাসীমাকে দেখতে চান, আজই অবশ্য অবশ্য যাবেন।"

সন্ধ্যার পায়ের ধ্বনি বেজে উঠছিল। পথের দীপ-মালা তাহা জানাই-তেছিল। বাড়ীটায় পৌছাইতে রণজিৎ আসিয়া বলিল—"এসেছেন, মাসীমা কেবলই আপনার কথা বলছিলেন। আজ ঘরের বাহিরে এসে তাঁর ভাল-বাসার কোন সঙ্কোচ নাই। কিন্তু ডাক্তার কোন উত্তেজনাকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে সাবধান হ'তে বলছিলেন, তাই ভাবছি—" রণজিৎ খানিক থামিল, তার পর বলিল, "না, সে ভেবে কোনও ফল নেই, মাসীমা

আপনাকে দেখেই যদি ম'রে যান, সে মরণ তাঁর কাছে প্রিয় হবে। তবে চলুন—"

রণজিতের সঙ্গে চলিলাম। একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষে রোগিণী শুইয়াছিলেন। পাশে একটি তরুণী বসিয়া বাতাস করিতেছিল। সে আমাদের দেখিয়া লম্বা একটা ঘোমটা টানিয়া অন্য দ্বারপথে পলায়ন করিল। যাইয়া দেখি, লাবণ্যললাম স্নেহময়ী জননীর সুন্দর মুখ রোগ-পাণ্ডুরতায় ম্লান, তাঁহার সবল তনুলতা অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। দেখিয়া আমার চক্ষে জলের ধারা বাহির হইয়া আসিল, রুদ্ধভাবের আবেগ আজ পথ পাইয়া সজোরে ছুটিয়া আসিল। আমি মাথা নীচু করিয়া ঘুমন্ত মাকে ডাকিলাম, "মা! মা! আমি এসেছি।" অশ্রু আমার দু চোখ বহিয়া ফাটিয়া বাহির হইল। আবার ডাকিলাম—"মা! মা!" রোগিণী যেন স্বপ্নঘোরে উত্তর করিলেন—"কে?" অতি ক্ষীণ সে স্বর।

"আমি যতীশ।"

রোগিণীর তন্দ্রা সহসা ছুটিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"এসেছিস্ বাবা, আমায় একবার মা ব'লে ডাক।"

"মা! মা আমার, এত দিন কেন আমায় মনে করেন নি?"

রোগিণী সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, শুধু বলিলেন,—"কৈ বাবা, এ দিকে এস, আমার বুকের পরে মাথা রাখ বাবা।"

আমি তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিলাম। তিনি তাঁহার দুর্ব্বল হাতে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। অতি কষ্টে যেন তিনি চোখ চাহিয়াছিলেন, চোখ বুজাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"আবার একবার ডাক বাবা।"

আমি ডাকিলাম, 'মা ! মা !'

তাঁহার যেন চেতনা লোপ পাইয়া আসিতে লাগিল। তাই আমি মাথা তুলিতে গেলাম, কিন্তু তিনি মাথা ধরিয়া রহিলেন। বাহিরে তখন পাশের বাড়ীতে কে গাহিতেছিল :—

'শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দ-গান গা রে হৃদয়
আনন্দ-গান গা রে॥'

ব্যবধান

রাত্রির জমাট অন্ধকার।

পাশে বধূ অঘোরে ঘুমাইতেছে, আমি জাগিয়া আছি। কাব্য নয়, গান নয়, অথচ জাগিয়া আছি।

ফুল-শয্যার রাত্রি, শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ এতক্ষণ নিশ্চয়ই গাঢ় ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে।

সকালে কাজের জন্য বাহির হইতে হইয়াছিল। পাকস্পর্শের উৎসবে সারা বাড়ী মাতিয়াছিল। ঝড়-বাদলের মাঝে যখন বাড়ী পৌঁছিলাম, কৌতুক করিবার জন্য তখন কোন তরুণীই জাগিয়া নাই।

সঙ্গে মালতীর মালা ছিল, নদীর মত্ত হুঙ্কারে যখন প্রাণসংশয় হইয়া উঠিল, তখনও মালা ছাড়ি নাই। যদি মরি, প্রণয়ের মধুর স্মৃতি আমার চিতাশয্যা হইবে।

পালঙ্কে বালিকা তন্দ্রাতুর!

হয় ত তাহার মনে গৃহের স্মৃতি-বেদনা জাগাইতেছিল। ঘুমের আধ-বিস্মৃতির মাঝেও যেন তাহার সুন্দর মুখ ভয়মলিন হইয়া উঠিয়াছে।

আদরের রেখা রক্তাধরে আঁকিয়া দিয়া বলিলাম—"রাণু!"

ঘুমের ঘোরেই বধূ বলিল—"আঃ, যাও।" পরক্ষণেই সে ঘুমে অবশ হইয়া পড়িল।

শ্রান্ত বধূকে না জাগাইয়া তাহার মাথাটি তুলিয়া মালতীর মালা তাহার গলায় ফেলিয়া দিলাম।

নাড়া-চাড়া লাগিয়া বধূর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়া বিরক্তিভরা স্বরে বলিল, "এ কি করছ?"

পরক্ষণেই গলার মালতীমাল্য বাহির করিয়া পাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রেমের ভাবাবেশময় অবদান ধূলায় ধূসর হইয়া আর্ত্তস্বরে যেন কাঁদিয়া উঠিল।

আমার প্রতি উপেক্ষার চেয়ে ফুলের প্রতি নির্ম্মমতা আমার অন্তর মথিত করিতে লাগিল।

কথা কহিলাম না। ক্ষোভে ও অভিমানে পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সেই হইতে জাগিয়া আছি, প্রহরের পর প্রহর রাত্রির মিছিল তারাদীপ জ্বালিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

সহস্রবার বলিয়াছি, বিবাহ করিব না।

মাতা শুনেন নাই। তাঁহার একমাত্র কথা, "আমাকে একটি রাঙা বউ এনে দে।"

মাকে জানাইয়াছিলাম, "মানুষের সাথে আমার কবি-মন মিশবে না।" মার উত্তর "ও-সব পাগলামী রাখ।"

নিরানব্বই স্থানে যাহা ঘটে, এখানেও তাহাই ঘটিল।

পাল-পাড়ার চৌধুরীরা জমীদার। তাহাদের সুরূপা মেয়ে "মেখলা।"

সকলে বলিল, মায়ের ভাগ্য ভাল, রায়পুরের কোনও ঘরেও এমন বধূ নাই।

আমি বলিলাম, "তথাস্তু।"

কিন্তু এখানেই ত জীবনের কাব্য শেষ হয় না। উপন্যাসে যখন মন মিলে না, তখন বিষপান চলে, না হয় উপসংহারের রহস্যের মধ্যে সমাধান মিলে। কিন্তু জীবনের প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চ দিনের পর দিন আসে। প্রভাতের মিলন-প্রভা সন্ধ্যার বিদায়-বাণীর মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

মেখলা সত্যই আদর্শ বধূ।

কর্ম্মে নিরলস, নির্ব্বাক্ মৌনতায় শোভমান। পড়শীরা মাকে পয়মন্ত বলিয়া প্রশংসা করে।

তথাপি মেখলার আর আমার জীবনের সুর মিলে না।

আমি যেখানে যতি টানি, সে সেখানে সুরের লীলানর্ত্তন জাগায়, এমনই করিয়া দিন কাটে।

আমি ভাবি—এই উদাস বিরহের অভিনয় কি চিরন্তন হইয়া রহিবে? কাব্য পড়িয়া আর কাব্য লিখিয়া হয় ত আমি সুস্থ ছিলাম না। মেখলার মাঝে আমি কল্পনার নায়িকা খুঁজি, তাহা কেমনে সম্ভব হইবে? দিন

যেন ফুরায় না। শীতের হিম বসন্তের লাবণ্যে ডুবিয়া যায়, বসন্তের মলয় গ্রীষ্মের রুদ্র আহ্বানে থর থর করিয়া কাঁপে, তাহার পর বর্ষার জলদ-জাল —অবশেষে শরতের আনন্দোজ্জ্বল ছবি। এমনই করিয়া বছর কাটিয়া যায়।

মন না মিলিলেও ঘর-বসত করিতে হয়। মেখলা ও আমার দিন বহিয়া চলে, বাহির হইতে কেহ জানে না যে, আমাদের মধ্যে লবণাক্ত সমুদ্রের গভীর ব্যবধান বর্ত্তমান আছে।

আমি থাকি কাব্যের নীড়ে, মেখলা থাকে কাজের ভিড়ে। আমার মনে যখন জীবনের ফেন-পুষ্পিত ভাবধারা উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন মেখলা হয় ত একটু কটু কথা বলিতে, সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

কেহ বলিবে, "তুমি কেবল কাব্য করিতেছ, মেখলার ত কোন দোষই তুমি দেখাচ্ছ না।"

সত্যই এইখানেই ছিল বড় গোল। বাহির হইতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না, তথাপি প্রেমের নৌকা ভরা জোয়ারে ডুবুডুবু।

ইহা ঠিক অনুভব করিবার, বলিবার নহে।

কেহ বুঝে না, তাই নিজের মনে গুমরিয়া মরি।

মা বলিলেন, "বউমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেই, এখানে যদি কোনও অসুবিধা হয়—"

মেখলা সন্তান-সম্ভাবিতা। মেয়েদের বাপের বাড়ীর দিকে টানের কথা সবাই জানে, কিন্তু মেখলা যাইতে চাহে নাই, ওদিক্ হইতেও কোনও আহ্বান আসে নাই।

আমি বলিলাম, "তোমার চেয়ে আপন আর কে হবে?"

মা কথা কহিলেন না, কিন্তু মেখলাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

মেখলা চলিয়া গিয়াছে, তথাপি যেন কোনও অভাব অনুভব করি না। দিন যেমন কাটিতেছিল, তেমনই কাটিয়া যায়।

কয়েক মাস পরে খবর আসিল, মেখলা পুত্র-সন্তানের জননী হইয়াছে।

মাতা নৌকা করিয়া পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া আসিলেন।

আমার যাওয়ার জন্য অনুরোধ, তাগাদা, এমন কি, অনুযোগ আসিল; কিন্তু আমি অচল স্থাণুর মত নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়া রহিলাম।

মা বলিলেন, "যা না পরেশ, খোকাকে দেখে আয়।"

আমি বলিলাম, "আস্‌লেই দেখব মা, তাড়াতাড়ি কিসের?"

মা রাগিয়া বলিলেন, "তুই যে চিরকাল ছেলেমানুষ রয়ে গেলি, ছেলের বাপ হয়েও কোন কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না?"

রাগ গায় না মাখিয়া উত্তর দিলাম—"মা, তোমার কোলে ছেলেমানুষ হয়েই যেন থাকি।"

মায়ের রাগ গলিয়া গেল। কৃত্রিম রোষে বলিলেন, "না বাপু, তোর সঙ্গে পারবার জো নেই।"

চার পাঁচ মাস পরে খবর আসিল, নবকুমারের অসুখ। এবার না যাওয়া চলে না। পুত্রকে দেখিতে চলিলাম;—শ্বশুর-গৃহে সবাই যেন আমার ব্যবহারে অপ্রসন্ন। জামাতার আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হইল না। কিন্তু তবু যেন বোধ হইল, সবাই যেন হৃদয়ের সঙ্গে মেলামেশা করিতেছেন না। আন্তরিকতার এই অভাব আমার মনকে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যায় পৌঁছিয়াছিলাম। খোকাকে যখন দেখিতে চলিলাম, তখন

রাত হইয়াছে। মেখলা গণেশ-জননীর মত কুমারকে কোলে করিয়া রহিয়াছে।

আমি রুষ্টভাবে বলিলাম, "খোকা কেমন আছে?" আমার কথার রূঢ়তা আমায় চমকিত করিয়া তুলিল। মেখলা কথা কহিল না! সম্মুখের দীপালোকে দেখিলাম, তাহার পাণ্ডু নয়নযুগল হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণপরে আত্মসংবরণ করিয়া সে মিনতি-ভরা সুরে বলিল, "আমি না হয় অপরাধী, এ তোমার কি করেছে?" কি বলিব, ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

খোকা জ্বরের ঘোরে ঘুমাইয়াছিল, কথার সাড়ায় জাগিয়া পড়িল। সে তাহার নীলাভ দীপ্ত চোখ দুটি মেলিয়া আমার পানে চাহিল। অমিয়-ভরা স্বর্গীয় হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

জননীগর্ব্বে গর্ব্বিতা মেখলা বলিল, "দেখছ, তোমায় দেখে খোকা কেমন হাসছে?"

সমস্ত ভার যেন লঘু হইয়া গেল, তৃপ্তচিত্তে বলিলাম, "রাগ করো না লক্ষ্মি! খোকাকে আমার কোলে দাও।"

———

বিপ্রলব্ধা

নিজের নিভৃত কুটীরে গাছ-পালা লইয়া থাকি। তরু-জীবনের বিকাশ ও বিবর্ত্তনের মাঝে কত যে সুর জাগে, কত যে রাগিণী বাজে, মন দিয়া, প্রাণ দিয়া তাহা অনুভব করি।

বন্ধুরা বলেন, "বয়ে গেছে।" গৃহিণী চটিয়া যান এবং অভিমান করিয়া বসেন। কিন্তু কি করি, তরুলতার মাঝে যে আনন্দ পাই, মানুষের সমাজে তাহা পাই না।

নিজের হাতে রোপিত ফুলগাছ যখন ফুলের সোহাগে সোহাগে হাসিয়া উঠে, তখন যে কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত পাই, কেমন করিয়া তাহা অপরকে বুঝাই।

বেশ ছিলাম নিজের নিরালা কুটীরে। বনের পাতার মর্ম্মরে যে ডাক আসে, তৃণের অঙ্গুলি যে স্পর্শ জানায়, প্রতিদিনের প্রভাতের আলোকে তাহার নূতন নূতন রূপ ও নব নব প্রাণস্পন্দন হৃদয়ে যে রস-মূর্ত্তি জাগাইয়া তুলে, তাহার তুলনা আছে কি? মানুষের জগতে এই অদম্য প্রাণময়তা, এই স্নিগ্ধ সুকুমার কমনীয়তা কোথায়?

কিন্তু না চাহিলেও, অবাঞ্ছিত দ্বারে আসিয়া দেখা দেয়। বাল্যবন্ধু সমীর একখানি মাসিক বাহির করিয়া ধরিয়া পড়িল। কলেজ-জীবনে প্রবন্ধ-রচনায় আমার নাম ছিল না; বলিলেও সমীর ছাড়ে না, বুঝিতে চাহে না। ঘরোয়া জীবন আর পড়ুয়া জীবনের সীমারেখা যে সমান্তরাল রেখার মত দুই বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সে মানিতে চাহে না।

কথায় শুনি, উপরোধে মানুষ ঢেঁকি গেলে। অতদূর সামর্থ্য নাই, কিন্তু ফরমায়েসী রচনা লিখিতে বসিতে হইল। ফরমায়েসী হইলেও হয় ত লিখিতে প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহা না হইলে 'বিশ্ববাণীর' পাঠকরা হয় ত মুগ্ধ হইত না।

'তরুলতার মর্ম্মবাণী' পড়িয়া অজানা ও অপরিচিত ভক্ত জাগিয়া উঠিল। এমনই এক জন ভক্তের উদগ্র উৎসাহ আমার বিজনতার আড়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার মৌন মাধুরী আকাশে যাদুমন্ত্র ছড়াইয়াছে। মালতীলতায় কুঞ্জ-রচনা করিতেছিলাম। ভক্ত আসিয়া কাজে বাধা দিলেন।

ভক্ত একবারে আধুনিক যুগের মানুষ। তাঁহার সমস্ত দেহে বর্ত্তমানের ভাব ও ভঙ্গী লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মাথায় বাবরী চুল, নূতন

রকম ভঙ্গীতে তাহাতে তরঙ্গোচ্ছাস। গায়ের গরদের আলখেল্লা বাতাসের সহিত লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়—পায়ে নূতন ধরণের জুতা। ভক্তের কাছে শুনিলাম, বেদ-বেদান্ত ঘাঁটিয়া তিনি বিনামার ছবি আঁকিয়া মুচিকে শিখাইয়া জুতা করিয়াছেন। জুতার মাথায় জরির পাগড়ীতে তাহাকে নব জীবনের অগ্রদূত বলিয়া মনে করাইয়া দিতেছিল, ভক্তের রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ। শান্তি-নিকেতনে কয়েক বৎসর পড়িয়া তিনি কবিগুরুর সমস্ত বাণী অধিকার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ভক্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনার লেখা যা সুন্দর হয়েছে, তা আর কি বলবো। অরূপ লোকের স্পর্শ যেন ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে!"

আত্মপ্রশংসার কি উত্তর দিব! চুপ করিয়া রহিলাম। ভক্ত জানাইলেন, "আমি কৃষি নিয়েই থাকতে চাই, দেখুন, আর্য্যের আর্য্যত্ব কৃষির উপর। বর্ত্তমানের কৃষ্টি ত সেই প্রাচীন কৃষির মধ্যেই আলো পেয়েছে। উপনিষদ নিশ্চয়ই পড়েছেন ত? জানেন ত, উপনিষদের ঋষি বলছেন যে, অসীম ওষধি ও বনস্পতির মাঝে আপনাকে প্রকাশ করেছেন—"

আমি উত্তর করিলাম, "যা বলছেন, খুবই খাঁটী, আপনার পড়াশুনা বেশ আছে দেখছি। আমি ত উপনিষদ পড়ি নি।"

ভক্ত বলিলেন, "আমিই কি পড়েছি? সব পড়তে গেলে সময় কোথা? অনুভূতি চাই। যে যুগে আমরা জন্মেছি, তার ভাব-উৎস প্রগাঢ় অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিতে হয়। রবি বাবু কি Biology পড়েছেন, তিনি কি য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক Theory মুখস্থ করেছেন, অথচ দেখুন, তাঁর কাব্যে কথায় কথায় Darwin, Bergson উঁকি দিয়ে যাচ্ছে।"

বুঝিলাম, ভক্তটি কবির ভাবুকতা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছেন।

আলাপ ও আলোচনার শেষে ভক্ত বলিলেন, "আমার গ্রামে আমি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করতে চাই, দেশের লোক যে যন্ত্র যন্ত্র ক'রে ক্ষেপে গিয়েছে, এ ভুল তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। কৃষির সুরই ত সৃষ্টির অনাদি চিরন্তন সুর। সেই সুরের হাওয়ায় দেশের মরা-গাঙ্গে বান ডাকাতে হবে—"

ভক্ত বেশ আলাপ করিতে জানেন। বাক্যের প্রেরণা তাঁহার অফুরন্ত —ঠিক যেন দম দেওয়া ঘড়ি, একবার দম দিলে বহুক্ষণ চলিতে থাকে। আমি ভদ্রতা করিয়া বলিলাম, "বেশ, শুনে সুখী হলুম। আশা করি, আপনার কাজ সফল হোক, আপনার প্রচেষ্টায় আমার গভীর সহানুভূতি জানবেন।"

ভক্ত চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "আপনি অত সহজে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আপনার কাছে আমার দাবী অধিক, কারণ, আপনি দরদী—"

মনে মনে ভাবিলাম, গৃহিণী এ আলাপ না শুনিলে বাঁচি। তাঁহার অল্প-বিদ্যা লইয়া তিনি ইহার কি সদর্থ করেন, সেই ভয়েই সমুদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

কিন্তু ভক্ত নিরঙ্কুশ। তিনি বলিয়া চলিলেন, "আপনার লেখা পড়েই বুঝতে পেরেছি যে, আপনি প্রেমিক লোক। আপনার কাছে তাই যাচ্ঞা করতে লজ্জা নেই।" ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু ভক্ত সংশয় দূর করিয়া বলিলেন, "শ্রাবণের পহেলা আমার কৃষিক্ষেত্রের উদ্বোধন-উৎসব হবে, সেখানে আপনাকে বক্তৃতা করতে হবে।"

আমি অবাক্ হইয়া উঠিলাম। বক্তৃতা করিতে পারি, এ দুর্নাম আমার

শত্রুতেও দিতে পারিবে না। শাস্ত্রে শুনিয়াছি, ভগবান্ ভক্তির বশ। আমার ভক্ত আমার অক্ষমতাকে বিনয় বলিয়া ধরিয়া লইলেন। অতএব পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বীকার করিতে হইল।

ভক্ত তখন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিলেন,—

"দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

২

শ্রাবণ-মাসের ক্ষান্ত-বর্ষণ প্রভাতের আলো!

মুগ্ধ-চিত্তে বিশ্বদেবতার মাধুরীর কথা ভাবিতেছিলাম। পত্নী বলিলেন :—

"আজ কি বক্তৃতা দিতে যাবে?"

ভক্তের আবেদন ভুলিয়া গিয়াছিলাম! পত্নীর কথায় বইয়ের পাতা উল্টাইয়া ভাবের খোরাক যোগাড় করিতে বসিলাম।

ভক্ত নিয়মমত বেলা তিনটায় মোটর লইয়া উপস্থিত। শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

শালের ফুলে বিছানো গৈরিক-রাঙ্গা পথ উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া কোন্ সুদূরে চলিয়া গিয়াছে! পাশে শালের ঝাড়ী জঙ্গলে তরুণ পাতার সবুজ কান্তি মনকে মাতাইয়া তুলে।

স্থানে স্থানে ধানের শ্যামলিমায় মাঠগুলি রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে কাণে বাদ্যযন্ত্রের মধুরধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম।

ভক্ত বলিলেন,—"সাঁওতালরা নাচ-গান করছে। দেখবেন ওদের নাচ? ওরা যেন ধরণীর প্রথম শিশু, পৃথিবীর চলার নৃত্য-তাল যেন ওদের অঙ্গে অঙ্গে কাঁপন তুলে দেয়। ঋতুর মিছিলের সাথে সাথে ওরাও যেন সুরে সুরে শিহরি ওঠে।"

সাঁওতালী নাচের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগ হয় নাই। পূর্ব্বে সাঁওতালরা বাঙ্গালীর গৃহে উৎসবে নাচিত, কিন্তু আমাদের সংস্পর্শে পড়িয়া আমাদের হাব-ভাব উহারা অনুকরণ করিতেছে, কাজেই উহাদের অবাধ জীবনের সুর যেন কিছু বাধা পাইয়াছে। তবুও উহাদের নিজেদের উৎসবে উহারা নাচ দিয়া, গান দিয়া উৎসব-দেবতাকে ঘরে বরণ করিয়া লয়।

ঔৎসুক্য তাই পূর্ণমাত্রায় ছিল। ভক্ত অভিপ্রায় জানিয়া সাঁওতাল-পল্লীর যে বাড়ীতে গান হইতেছিল, তাহার সম্মুখে গাড়ী থামাইলেন।

সীতা-পত্রের ছায়াতলে দশ বারো জন সাঁওতাল যুবতী মাদলের তালে তালে নৃত্য করিতেছিল। কি সুন্দর সে নৃত্য! অঙ্গভঙ্গীর উল্লাসে যেন চারিদিকে আনন্দ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। কয়েক জন যুবক ধামসী ও মাদল বাজাইয়া তাথৈ তাথৈ নৃত্য করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে গায়িকাদের প্রতি চকিত হসিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। বিনিময়ে কালো চোখের বিদ্যুদ্দাম তাহাদিগকে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছিল।

ভক্ত বলিলেন, "বাড়ীতে বিয়ে আছে।"

মুক্ত আকাশের তলে ধরণীর মুক্ত শিশুদের আনন্দ-নৃত্য দেখিয়া মনে যেন আদিম মানবের মনের উল্লাস অনুভব করিতেছিলাম। মেয়েরা গান

করিতেছিল। সুর-জ্ঞান নাই বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করেন, কিন্তু বে-সুরা কাণেও যেন সে গান অপূর্ব্ব লাগিতেছিল। তাহারা যে গান করিতেছিল, হরফে তাহার সুর জোড়া যায় না ; কিন্তু গেঁয়ো সাঁওতালী সুরে অতি মধুর লাগিতেছিল। যুবতীরা সুরের তালে তালে গাহিতেছিল ঃ—

"সড়ক্ সড়ক্ তে রুহিন্ দারে লাং রহএ লাং।
রুহিন্ দারে লাং রহএ লাং।
হিজু তে ছেনতে দালাং চুলা
গু জুঃ রে বুরু রে ক্রনতুম তাহে না।"

বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে ভাবার্থ দাঁড়ায় ঃ—

"রুয়ে এলাম গাছের সারি পথের বাঁকে বাঁকে—
ওগো রুয়ে এলাম পথের ধারে ধারে,
সলিল-ধারা সেচন করি কাজের ফাঁকে ফাঁকে
মরণ হ'লে রাখবে স্মৃতি ডাকবে বারে বারে।"

বংশ-বিস্তারের কামনা মানুষের আদিম বৃত্তি। সাঁওতাল জাতির অপুষ্ট মনে তাই মানুষের আদি কামনা আদিম সরলতায় সুন্দর ভাবা পাইয়াছে।

বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব নৃত্যকলা দেখিতেছিলাম আর বিভ্রান্ত-মনে গানের সুরে সুরে বৃহৎ অভিব্যক্তির কথা যেন বুঝিতে পারিতেছিলাম। গান শুনিতেই বিভোর ছিলাম। সহসা দেখি, ষোল সতের বয়সের একটি যুবতী ছুটিয়া মোটরের নিকট আসিল। পরনে 'ডুরিয়া' সাড়ী, হাতে 'শাকম' আর পিতলের খাড়ু। কালো চেহারা বটে, কিন্তু তাহার সুঠাম ও সুন্দর গঠনের পারিপাট্যে তাহাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছিল। সুস্থ

ও সবল চেহারা আর 'কালো হরিণ-চোখ' মিলিয়া তাহাকে অনিন্দ্য দেখাইতেছিল। মোটরের কাছে আসিয়া সে উৎসুক-ব্যাকুলতায় জিজ্ঞাসা করিল ঃ—"ওকা দিশম্ থন্ এম হেজ আকানা? ডুলারিয়া গাতে ইং এম এ্ঞেল আকাদেয়া?" আর্ত্ত ব্যথিত স্বর।—সাঁওতালী কামিন মাঝে মাঝে বাড়ীতে খাটে, তাহাদের কাছ হইতে কিছু কিছু ভাষা শিখিয়াছিলাম, তাহাতে ও বক্তার কণ্ঠ-ভঙ্গীতে বুঝিলাম, প্রশ্ন করিতেছে—"তুমি কোন্ দেশ থেকে এসেছ? আমার প্রিয়তমকে কি দেখেছ?"

ভাষা না জানিলেও যে মনোভাব বুঝা যায়, ইহা সত্য। ভাব যখন প্রবল হয়, ভাষাতে সে প্রকাশের ছল খুঁজিয়া ফেরে। প্রিয়হারা বিরহীর হৃদয়-বেদনা যেন সেই শান্ত সৌম্য মুখে মলিনতার ছায়া গাঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভঙ্গী, তাহার দৃষ্টি, তাহার ব্যাকুলতা সত্যই অপূর্ব্ব —ভাষায় প্রকাশের অতীত!

আমাকে নিরুত্তর ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া তরুণী মিনতিভরা স্বরে প্রশ্ন করিল, "গাতে ইং এমএ্ঞেল আকাদেয়া? ঔনিদ ওকারে মেনায়া?"

"সে কোথায় আছে?" কেমন করিয়া বলিব! প্রিয়-বিচ্ছেদকাতরা তরুণীকে কোন্ ভাষায় সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া পাইলাম না।

তাহাকে দেখিয়া শ্যামহারা রাধার ব্যাকুলতার ছবি মনে জাগিতেছিল। আমার ভাবুকতার স্রোতে বাধা না দিয়া, আর বিমূঢ় আমাকে মুক্ত করিবার জন্য ভক্ত সাঁওতাল ভাষায় বেশ পরিষ্কার স্বরে বলিলেন, "তেহেং গি হিঃ জু আয়।"

তরুণীর আনন হইতে সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া গেল। প্রসন্ন হাস্যে ও পরিতৃপ্তিতে তাহার সারা দেহে যেন আনন্দ-শিহরণ জাগিয়া উঠিল।

সমস্ত ব্যাপার যেন জটিল বলিয়া মনে হইল। কে আসিবে? কাহার জন্য তরুণীর ব্যাকুলতা?

ভক্ত বলিলেন, "সে আজই আসিবে।"

আমি অবাক্ বিস্ময়ে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। ভক্ত বলিলেন, "বলছি। এখন চলুন, যাওয়া যাক্। যেতে যেতে সব আপনাকে বলবো।"

মোটর ছাড়িয়া দিল, তরুণী উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার সারা অন্তর যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

মাদলের তালে তালে 'কপলা তসরিং' তখনও চলিতেছিল। বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার সুর কাণে বাজিতেছিল।

৩

ভক্ত বলিতে বলিতে চলিলেন:—"ঐ মেয়েটির নাম চম্পা। আমাদের শালবনের রক্ষক হপনা সাঁওতালের মেয়ে। ওর জীবনে একটা করুণ ইতিহাস আছে। বিয়োগান্ত নাটকের মত করুণার্দ্র—দুঃখীর বেদনার মত তীব্র।" ভক্ত আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমাকে উদ্গ্রীব ও শ্রবণতৎপর দেখিয়া তাঁহার উৎসাহ বাড়িল। তিনি বলিয়া চলিলেন, "সীমান্তবাসী বলেই হয় ত আমরা ওদের সাঁওতাল বলি, কিন্তু ওরা নিজেদের বলে হড়—এ যেমন ভারতবাসীরা হিন্দু ব'লে চ'লে গিয়েছে। ওদের ভাষায় হড় মানে মানুষ, নিজেদের মানুষ ব'লে পরিচয় দিতেই ওরা যেন গৌরব বোধ করে—এ যেন চণ্ডিদাসের কথা—

'শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই'।"

গল্প শুনিবার জন্য মন উৎসুক, গৌরচন্দ্রিকার জ্বালায় অস্থির হইলাম, কিন্তু উপায় নাই, কাব্যরসরসিক ভক্তের রসচর্চ্চায় বাধা দিয়া 'বেরসিক' বনিয়া যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না। তাই নীরবে সম্মতিসূচক অভিনন্দন জানাইলাম। ভক্ত বলিতে লাগিলেন :—"মেয়েটিকে দেখলেন ত? এখনও উহার সুসমঞ্জস রূপ নয়নকে তৃপ্ত করে, কিন্তু বছর দুয়েক আগে দেখলে আপনিও কবিগুরুর কথায় বলতেন—'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই ত তোমার আলো'। যেমন সন্নত ঋজু দেহ, তেমনি স্বাস্থ্য-সুন্দর কমনীয়তা, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত। কালো সাঁওতালের মেয়েদের যে সৌন্দর্য্য আছে, এ কথা অনেকে ভাবতে পারে না। কিন্তু আপনি যদি দেখেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন।"

ভক্তের এ কথায় অবশ্য আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ স্বাস্থ্য, বনশিশু সাঁওতালদের মধ্যে বনজ-প্রকৃতির মত যে স্বভাবজ মাধুর্য্য আছে, তাহা সভ্য মানুষকেও মুগ্ধ করে।

"তিন বছর আগে হপনার অসুখ হয়। তখন জংলা পূবে কাজ করতে চলেছিল, হপনা তাকে আপন ঘরে স্থান দেয়। পাহাড়-ধারে অরুণ জঙ্গলে তার বাস, সেই পাহাড়ের মতই জংলা তার মন আর জংলা তার রূপ। কিন্তু তা হ'লে কি হয়? তরুণ মন আর তরুণী হিয়া যখন আকুলতায় গান গেয়ে ওঠে, তখন পুষ্পধনু যে শর হানেন, তার প্রভাব কে অতিক্রম করতে পারে? সাঁওতালী বাঁশী বাজানো আপনি শুনেছেন কি? কি অপূর্ব্ব তার মোহ! জংলা সাঁওতালের বাঁশীর উন্মাদ ব্যাকুলতা চম্পার মর্ম্মের স্তরে স্তরে দিনে দিনে প্রেমের গাঁট বাঁধছিল। হপনা যখন

সুস্থ হয়ে উঠল, তখন জংলা আর চম্পার ভাব গাঢ় হয়ে উঠেছে। কাজেই দু'জনকে বিয়ে দিয়ে হপনা উৎসবের ঘটা করল।"

উপন্যাসের মতই মনোজ্ঞ বটে। আমার সমগ্র চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল।

ভক্ত তাঁহার লীলায়িত কেশগুচ্ছ ললাট হইতে সরাইয়া বলিয়া চলিলেন—

"বিয়ের পর চম্পা আর জংলা বেশ মনের সুখে ছিল। ওদের সে মিল দেখ্‌লে 'রোমিও ও জুলিয়েট' লেখা চলে। কিন্তু না আছে ওদের লেখ্য ভাষা, না আছে ওদের লিখিয়ে লোক।

"প্রেমের স্বপ্নমদির দিনগুলির মাঝে ভূতের মত এক বিপদ এসে উপস্থিত হ'ল! জংলার সাথে যারা পূবে গিয়েছিল, তারা ফিরে এই গ্রামের ছাতিমতলায় আড্ডা নিলে। জংলার বিয়ের কথা শুনে তারা ক্ষেপে উঠল।"

আমি সভয়ে ও সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম, "কেন?"

ভক্ত বলিলেন,—"সেটাও একটা ইতিহাস। খৃষ্টানরা যেমন বলে আদম আর হবা তাদের আদি পিতা ও মাতা, সাঁওতালরাও তেমনি বলে পিল্‌চু হারাম্‌ আর পিল্‌চু বুড়হি তাদের আদি পিতা-মাতা। ইজরায়েল-দের যেমন বারোটি বংশ, এদেরও তেমনি টুরু, কিনকু প্রভৃতি বারোটি বংশ আছে। সাঁওতালদের নিয়ম যে, এক বংশের লোকের মধ্যে বিয়ে অত্যন্ত গর্হিত। ব্যাপার হয়েছিল—জংলা টুরু আর হপ্‌না টুরু। হিন্দুর যেমন সগোত্রে বিবাহ নিষেধ, ওদেরও তাই। কাজেই জংলার লোকরা জংলাকে ঘরে ফিরে যেতে বল্‌ল। বেচারা করে কি? প্রেমের জন্য

সর্ব্বস্ব ত্যাগ উপন্যাসে চলে, সমাজে যারা বাস করে, সমাজের কঠোর শাসন তাদের মানতে হয়। তার পর সাঁওতালদের মধ্যে সমাজ-শাসন এখনও অব্যাহত আছে। জংলা চম্পাকে ভুলিয়ে পালিয়ে গেল। হপ্‌না পড়শীদের খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করল। কিন্তু বনবালা চম্পা কিছুতেই বুঝে না। পাগলিনীর মত সে জংলার আসার আশায় পথ চেয়ে রয়েছে।"

বক্তা চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর ?"

"হপনা ভেবেছিল যে, সময়ে চম্পা আত্মস্থ হয়ে উঠবে, কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই ভুলছে না। এ দিকে চম্পাকে 'সাঙ্গা' করবার জন্য বহু লোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদেরই এক জনের সাথে চম্পার সাঙ্গা হবে, নাচ-গান তারই জন্য হচ্ছিল।"

উৎসুক-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চম্পা কি রাজী হয়েছে ?"

ভক্ত বলিলেন, "না, পাগলী কি রাজী হয়! ওকে ভুলিয়ে বলা হয়েছে যে, জংলাই আসছে।"

ভক্ত চুপ করিলেন। অপরাহ্নের স্তিমিত আলোয় মোটর ছুটিয়া চলিল। চারিদিকে যেন এক মায়াবী মায়াজাল বিস্তার করিয়া আকাশে বাতাসে যাদু ছড়াইতেছে। কিন্তু সে দিকে বা মোটরের গতিবেগের দিকে আমার মন ছিল না। আমার মনে থাকিয়া থাকিয়া চম্পার করুণ ও বিষাদার্ত্ত মুখখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নূতন বর যখন প্রবঞ্চনার বেশ লইয়া দেখা দিবে, তখন চম্পা কি করিবে, তাহার সম্ভব অসম্ভব কল্পনা-বিলাস লইয়া মন ব্যাপৃত রহিয়া গেল। নূতনত্বের সরল আবেদন ব্যর্থই হৃদয়ে ঘা দিতেছিল। একান্তমন হইয়া কেবল চম্পার হৃদয়-বেদনা রসের আয়নার মাঝ দিয়া পলে পলে অনুভব করিতেছিলাম।

৪

ভক্তের রুচি ও সৌষ্ঠবজ্ঞানের প্রশংসা করিতে হইবে। তাঁহার 'আদর্শ কৃষিক্ষেত্র' বহু বিস্তৃত মাঠের মধ্যে স্থাপিত। নীলাকাশ যেন উহার চারিদিকে চুম্বন দিয়া যাইতেছে। পাতাবাহার গাছের বেড়া দিয়া সমস্ত বাগানটি ঘেরা, মাঝ দিয়া রং-বেরঙ্গের কতরকম বীথি চলিয়াছে, মাঝখানে স্বচ্ছতোয় সরোবর। স্থানে স্থানে পুষ্পের কুঞ্জ ও লতাগৃহ। বীজ হইতে চারা করিবার জন্য কয়েকটি সুদৃশ্য খড়ের ঘর স্থানে স্থানে সুবিন্যস্ত নিয়মানুসারে সজ্জিত রহিয়াছে। ভক্তের যত্ন-চেষ্টায় যেন নির্জীব ধরণী সজাগ হইয়া অপরূপ হাস্যে হাস্য করিতেছেন।

সভার আয়োজনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। গানের পর গান চলিয়াছিল। মাঝে মাঝে দুই এক জন বক্তা মিনিট দশ করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। বক্তৃতাগুলি ভাবার মাধুর্য্যে আর বলিবার সহজ ভঙ্গীতে বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। তাহার পর, আমাকে কিছু বলিতে হইল। কি যে বলিয়াছিলাম, মনে নাই। মনের মধ্যে চম্পার ব্যথা জমাট হইয়া উঠিতেছিল। বঞ্চিতা নারীর প্রতি অনুকম্পা আমার সমস্ত চিন্তাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবাবেগে সামান্য কিছু বলিলাম। ধন্যবাদ ও জলযোগান্তে যখন বিদায় লইলাম, তখন রাত প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

আমি কল্পনা করিতেছিলাম, সেই দূর পল্লীপ্রান্তে হয় ত তখন চম্পার হৃদয়বিদারক বিবাহ-দৃশ্য অভিনীত হইতেছে। হয় ত কোন সাঁওতাল নারী বিবাহ-মঙ্গল-সূচক 'সেরিং' গাহিয়া নবদম্পতির মিলনকে পূর্ণ ও

পবিত্র করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। আর চম্পা হয় ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুনিতেছে—

"নাপায় গো হান্ হাঁর হুং
নাপায় গো হোন্ঝ হাঁর হুং।"

"শাশুড়ী ভাল, শ্বশুর ভাল।"

সমস্ত আনন্দোৎসব হয় ত তাহার মনে কোন ছাপ দিতেছে না। মতিচ্ছন্ন অজ্ঞানের মত সে হয় ত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

রাত্রির কালো বসনের মাঝে তারার মণির চুমকি জ্বলিতেছে। সমস্ত বন-ভবনে মৌনতার অসাড় স্পর্শ জাগিয়াছে। সেই নীরব নিস্তব্ধতার সমতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে।

মোটরের উজ্জ্বল আলোক পথের খানিক অংশে পড়িয়া পথকে দীপ্ত করিতেছে, আর তাহার পাশেই অন্ধকারের অবাধ রাজ্য অব্যাহতপ্রভাবে চলিয়াছে। যেন কত রহস্য সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলার মাঝে অভিনীত হইতেছে।

মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, সাঁওতাল কুটীরের পাশেই আসিলে গাড়ী থামাইতে বলিব। কিন্তু আমি চলন্ত যান হইতে স্থান নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। হঠাৎ গাড়ীর থামার শব্দে চাহিয়া দেখি, মোটরের উজ্জ্বল আলোর সম্মুখে চম্পা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাথায় তাহার সিন্দূর-টিপ জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে, কালো চুলের উপর গন্ধ ছড়াইয়া মালতী-মালা দুলিতেছে। ভৎর্সনাভরা সুরে সে ভক্তুকে বলিল, "আম চেৎ লেকাতে নোয়া লেকা কাথাদ মেন্ কেদাম ?—তুই কেমন ক'রে এ কথা বল্লি ?"

ভক্ত কথা ফিরাইয়া বলিল, "আম্ আ বাপলা হোয় আকা না? তোর কি বিয়ে হয়েছে?'

চম্পা কথা কহিল না। রাগে ও অভিমানে তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল।

ব্যাপার বুঝিলাম। চম্পা প্রতারিত হয় নাই। প্রলোভন তাহার প্রেমকে পিষিয়া ফেলে নাই।

ভক্তের সহিত সে আর কথা কহিল না। আমার নিকট আগাইয়া আসিয়া সগুশ্ছিন্ন সীতা-পত্রে খড়িকা দিয়া কি লিখিল, তাহার পর আমার হাতে পাতাটি দিয়া বলিল, যেন আমি সেই চিঠি দুলারিয়া জংলাকে দেই।

ভক্ত বলিলেন যে, সীতা-পত্রের পাতায় কাঠি দিয়া লিখিলে সে লেখা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। জনশ্রুতি যে, সীতাকে যখন রাবণ ধরিয়া লইয়া যায়, তখন সীতা এই তরুর পাতায় আপন হরণ-কাহিনী লিখিয়া যান। সেই হইতে এই বৃক্ষের নাম সীতা-পত্র।

ভক্তের কথায় অবাক্-বিস্ময়ে পাতাটিকে আলোর নিকট ধরিয়া দেখিলাম যে, চম্পার হিজিবিজি দাগ চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে।

চম্পা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল, "নোয়া চিঠিদ জংলা এমায় মে। জংলাকে এই চিঠি দিস্।"

হায় বিরহিণী নারী! যে বিরহ-ব্যথা তোমার অন্তরে আগুনের মত ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে, কেমন করিয়া তাহা নিভাইব! কিন্তু সত্য বলিয়া পাগলিনীর মনের ব্যথা বাড়াইয়া লাভ নাই! তাই মিথ্যা জানিয়াও বলিলাম, "দিব।"

আশায় আনন্দে চম্পার আননে পুলক-রেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া মিলাইয়া গেল। রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। অপেক্ষার সময় নাই। চম্পা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "দিবে ত ?"

মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। মোটর ছাড়িয়া দিল। সম্মুখে উচ্চাবচ পথ কোন্ সুদূরে চলিয়াছে, কে জানে ? অনন্ত কালও পলকে পলকে আপনার জয়গান গাহিয়া চলিয়াছে।

পিছনে কে কোথায় মর্ম্মভেদী বেদনায় কাঁদে, কোথায় চোখের জল ফেলে, জগতের গতিবেগ তাহা দেখিবার জন্য থামে না। আমারই শুধু রহিয়া রহিয়া মন অবর্ণনীয় এক অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। ঘরে ফিরিতেই শুনিলাম, প্রিয়া হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া গাহিতেছেন ঃ—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল—"

সহানুভূতির সোনার কাঠি জগৎকে এক করিয়া লয়! অন্তরে যাহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাহার অনুরণন শ্রুত হয়। চম্পার বেদনা হয় ত অজ্ঞাতে গৃহিণীর সুরকে করুণ ও কোমল করিয়া তুলিয়াছিল।

সব ভাল যার শেষ ভাল

১

ছুটীর দিন বলিয়া মনটা ভারি খুসী ছিল। প্রভাতের রৌদ্র শীতের দিনে বেশ মধুর লাগিতেছিল। সম্মুখের বাড়ীর ছাদে একরাশ গোলাপ ও গাঁদা ফুটিয়াছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া মনটা আল্‌গা হাওয়ায় যেন কল্পনালোকে উড়িয়া চলিতেছিল।

গৃহিণী আসিয়া একগাদা চিঠি দিলেন। চিঠি পাওয়াকে আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি। অনেক দিন মনে হয়, পিয়ন যদি তাহার সমস্ত ব্যাগ উজাড় করিয়া আমায় দেয়, তাহা হইলে কি মজা হয়! চিঠি পড়িবার সময় আমার মন খুসী থাকে, এ খবর প্রিয়তমার অজ্ঞাত ছিল না, তাই তিনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া আবদার ধরিলেন, "চল না, এই ছুটীতে মধুবন বেড়িয়ে আসি।"

প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা লক্ষ্মি, আগে গরম গরম কড়াই-শুঁটির কচুরি ভেজে খাওয়াও।"

"ও সব চালাকীতে ভুলছি না কিন্তু, অনেকবার ফাঁকি দিয়েছ—এবার যদি না হয়, তা হ'লে এমন আড়ি হবে—"

কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "আমার চিঠি পড়ায় যদি বাধা দেও, তা হ'লে এমন চটবো কিন্তু—"

ইহাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া গৃহিণী হাসিয়া জবাব দিলেন, "তোমার রাগের বহর জানি। যাক্, এখন তর্কের সময় নয়। খাবারটা নিয়ে আসি।"

গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আর যতই দোষ থাকুক, হাতের রান্নাটি ছিল মন-ভুলানো, আর এই গুণেই ঔদরিক স্বামীকে তিনি বশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বন্ধুমহলে স্ত্রৈণ বলিয়া একটি বিশেষণ অর্জ্জন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার কাল-পেঁচাটি'র হাতের রান্না যিনি খাইয়াছেন, তিনিই জানেন যে, কি গুণে তিনি আমায় বশ করিয়া রাখিয়াছেন।

ডাকের চিঠিখানি পড়ার দিকে মন দিলাম। বাল্য-বন্ধু মণীশের পিতা লিখিতেছেন :—

"বাবা যতীন,

তোমার অমায়িক চরিত্র ও মধুর ব্যবহারে আমরা বরাবরই প্রীত আছি। তোমাকে আমরা মণীশের বন্ধু বলিয়া ঘরের ছেলের মতই মনে করি। সেই জন্য তোমাকে আজ একটি বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। মণীশের গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, ফাল্গুনেই মণীশের বিবাহ দেন। কিন্তু মণীশ বিবাহ করিবে না বলিয়া লিখিয়াছে, এ জন্য অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে।

মধুপুরের অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ রমণী বাবুর কন্যার সহিত কাজ করিতে আমরা একপ্রকার কথা দিয়াছি। এই সরস্বতী-পূজার বন্ধে মণীশকে লইয়া তুমি কৌশলে কন্যা দেখাইয়া, যদি তাহাকে সম্মত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার কাকীমা বিশেষ খুসী হইবেন। তুমি আমাদের স্নেহাশিস্ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীরমাপ্রসন্ন রায়।”

পত্র পড়িয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় গৃহিণী চা ও গরম গরম কচুরি হস্তে দেখা দিলেন। নারীদের এই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিটি কি মধুর! কাব্যশাস্ত্রগুলি নিশ্চয়ই সাগুখোর পেট-রোগাদের লেখা, নচেৎ পত্নীর সেবা-ব্রতা কল্যাণী মূর্ত্তির মহিমা ভুলিয়া কেবল সোহাগ কুড়াইতে আর প্রলাপ বকিতে সময় অপব্যয় করিতেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্যরচনা আমার আসে না। তাহা না হইলে একবার পত্নীর এই দ্রৌপদী-মূর্ত্তিটি সাধারণ্যে আমি সগর্ব্বে প্রচার করিতাম। কিন্তু এ শুধু অরণ্যে রোদন। কারণ, ছোট বয়স হইতেই ছন্দ আর সুর দুই-ই আমার কাণ এড়াইয়া যায়।

গৃহিণী আসিয়া সুর ধরিলেন, “নাও, খাও, ব’সে ব’সে ভাবনা হচ্ছে কিসের? তা হ’লে গুছিয়ে নেই—কি বল?”

কচুরি-ভক্ষণতৎপর মুখ সহসা কথা কহিতে চাহিলেন না। নিরুত্তর দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, “বা! কথা কইছ না যে? বুঝেছি, কাজের সময় কাজী, কায ফুরালে পাজী—মজার লোক ত তুমি?”

“বাঃ, তুমি খেতেও দেবে না দেখছি। অমন যদি কর, তা হ’লে গেরুয়া বসন কিনে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়বো বলছি।”

"হয়েছে মহারাজ! আমিও না হয় বিবাগিনী হয়ে প্রভুর গাঁজার কলিকা ধরিয়ে দেব।"

কৃত্রিম কোপে বলিলাম, "এঁ্যা, পরিহাস, স্বামি-দেবতার সঙ্গে পরিহাস? জান কি পেচক-বাহিনি! যদি নেহাৎ রেগে শাপ দিয়ে দেই—"

"তা হ'লে গলবস্ত্রে ক্ষমা চাইছি।"

"বেশ, প্রীতোঽস্মি, বল, কি বর প্রার্থনা কর?"

"হে দেবদেব! যদি কৃপাপরবশ হয়ে অধীন অবলার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই ছুটীতে যাহাতে পরেশনাথ দর্শন হয়, তাহার বিধান করুন।"

হাসি চাপিয়া বলিলাম, "হে অজ্ঞান অবলে, তুমি ত জান না, দুরারোহ পর্ব্বতারোহণে কি দুঃসহ ক্লেশ, তার উপর তোমার স্বামি-দেবতার বর্ত্তমানে বিশেষ আবশ্যক কাজ, অতএব হে সাধ্বি, তুমি তোমার প্রার্থনা প্রত্যাহার কর, আমি তোমায় অন্য বর প্রদান করছি—জড়োয়া চুড়ি, হীরার বালা, বেণারসী শাড়ী কিংবা অন্য যে বরে তোমার অভিরুচি হয়, হে সুচরিতে! আমি তোমায় সেই বর প্রদান করছি।"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আর রক্ষা করা চলিল না। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। গৃহিণীও মুখে কাপড় চাপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময় জুতা মস-মস করিয়া মণীশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। "কি দাদা! আজ ভোরবেলায় এত হাসির হল্লা প'ড়ে গেছে যে? ব্যাপার কি?"

হাসিয়া বলিলাম, "ভায়া, বিয়ে কর নি, বেশ আছ, তা হ'লে বুঝতে কি বিষম লেঠা, কেবল দেহি-দেহি রব শুনে প্রাণান্ত হয়ে ওঠে।"

গৃহিণী এবার রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমরা ত আজ সভ্য হয়েছ ব'লে বড়াই করছ, কিন্তু নিরীহ মেয়েজাতের উপর এই যে মিথ্যা নিন্দা কাগজে-কলমে, পথে-ঘাটে প্রচার করছ—এর কি কোনও প্রতীকার নেই?"

মণীশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না বৌদি! এ তুমি অন্যায় কথা বলছ। তোমরা দুপাতা ইংরেজী প'ড়ে আজকাল বিলেতী মত আমদানী ক'রে দেশকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছ। আমাদের দেশে নারীর যে সতীত্ব, সে সতীত্ব পতির মান-অপমান, আদর-নিন্দা উভয়কেই মূল্যবান্ মনে করেছে। এই আদর্শ ক্রিয়মাণ ছিল বলেই না সীতা বনবাসদুঃখকে অক্লেশে গ্রহণ করে-ছিলেন—কিন্তু সে দিন আর নেই—"

"থাক, হয়েছে, ঠাকুরপো! সব শেয়ালের এক রা-ই হবে জানা কথা। ও সব থাক, একটু চা দেবো কি?"

"না, বৌদি, চা-পান আমি করি নে, চা-পান যা, বিষপানও তাই। যাক, কি নিয়ে ঝগড়া চলছিল?"

"ঝগড়া কিসের, ঠাকুরপো! আমি তোমার ব্যয়কুণ্ঠ দাদাটিকে পরেশ-নাথে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু ওঁর ওজরের অন্ত নেই।"

"আচ্ছা ভাই মণীশ, তুমি সাক্ষী, এই পতিনিন্দাটি কি সুধামাখা লাগছে?"

"না দাদা, ও সব দাম্পত্য-কলহের বিচার আমার মত অরসিক লোকের দ্বারা হবে না, তবে বৌদি যদি দয়া ক'রে যান, তবে আমার গাড়ীতেই আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে পারি।"

মণীশের নূতন ফিয়াট গাড়ী ছিল। সেটায় চড়িয়া ভ্রমণ বেশ সুখকরই হইবে বলিয়া মনে হইল। আমার মাথায় সহসা একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

"দেখ মণীশ, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে মধুপুর যাও, তা হ'লে আমি রাজী আছি।"

গৃহিণী বাধা দিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আমার চোখের ইঙ্গিতে নিরস্ত হইলেন। মধুপুর নাম শুনিয়া মণীশ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃসন্দেহে বলিল, "বেশ, তাই যাবো—তা হ'লে দুপুরে খেয়েই বেরুবো।"

গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরপো। তোমায় যে কি ব'লে ধন্যবাদ জানাব, ভেবেই পাই না।"

আমি কৌতুক-নিগূঢ় হাস্যে বলিলাম, "বল না, তোমার ঘাড়ে পেত্নী চাপুক।"

মণীশ উঠিয়া বলিল, "ওর জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই, তবে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়া চাই। আমি চল্লুম, আপনারা গুছিয়ে নিন। ঠিক সাড়ে এগারোটায় আমি পৌঁছবো।"

২

গৃহিণীকে তালিম করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। কারণ, বিবাহের নাম শুনিলেই মেয়েরা যে খুসী হইয়া ওঠেন, ইহার জন্য বোধ হয় গবেষণার প্রয়োজন নাই।

রাঁচি হইতে হাজারিবাগ পর্য্যন্ত মোটর-ভ্রমণ যে কি সুখাবহ, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। প্রকৃতির সেই মানসমোহন ছবিটি অন্তরের নিবিড়তম স্থানকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করে।

মোটর চলিল। উচ্চাবচ ভূমির মাঝ দিয়া, পর্ব্বতশিখরের উপর দিয়া সে যাত্রা কি সুন্দর, কি মনোরম!

পরেশনাথে সন্ধ্যায় পৌঁছিলাম। পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইয়া চারিদিকের কি প্রাণারাম দৃশ্য! গৃহিণী সুযোগ বুঝিয়া মণীশকে বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! এখানে একা বেড়িয়ে কি আনন্দ হয়, আর কত কাল আইবুড়ো থাকবে বল?"

মণীশ উচ্ছ্বসিত আবেগে দিক্‌চক্রবালে চাহিয়াছিল, ফিরিয়া বলিল, "না বৌদি, বউয়ের চেয়ে বই অনেক ভাল, বউ ঝগড়া করে, বই কখনও করে না।" এই বলিয়া মণীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বৌদি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা সত্য বটে, কিন্তু সে ঝগড়াটাও খুব মিষ্ট লাগে, শুষ্ক বই নিয়ে মানুষের জীবন চলে না।"

আমি বলিলাম, "না রাণি! তুমি কি অন্যায় বকছ? আমার বন্ধুদের মধ্যে একা মণীশই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য পালন করছে—তাকে তোমার প্রলোভিত করা উচিত নয়।"

আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'লে কি চিরকুমার থাকবে, ঠাকুরপো?"

মণীশ বলিল, "না বৌদি, চিরকৌমার্য্যের ব্রত অবশ্য অবলম্বন করি নি। তবে বর্ত্তমানে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে—আমার গবেষণাই আমার সব মন অধিকার ক'রে রেখেছে—সেখানে কারও প্রবেশের অধিকার নেই।"

গৃহিণী না হটিয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু জেনো, ঠাকুরপো, যাদের তুমি এত অবজ্ঞা করছ, এক দিন তাদেরই পায়ে পুষ্পাঞ্জলি তোমায় দিতে হবে।"

"তা নিয়ে আজ তর্ক ক'রে লাভ নেই, বৌদি। তার চেয়ে চলুন, ওধারে মন্দিরটা ঘুরে আসা যাক্।"

আমি বলিলাম, "না মণীশ, এখন চল, ফেরা যাক্।"

পরেশনাথ হইতে গিরিডি হইয়া মধুপুরে এক বন্ধুর গৃহে অতিথি হইলাম। পৌঁছিয়াই গৃহিণী কালবিলম্ব না করিয়া মণীশের ভাবী বধূকে দেখিতে গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া যে বর্ণনা দিলেন, তাহা আশাপ্রদই। কন্যাটির বয়স সতের আঠারো। বি-এ পড়িতেছে, যেমন নরম স্বভাব, তেমনই মিষ্ট কথা, তেমনই মিষ্ট গান। রমণী বাবু আর তাঁহার স্ত্রী উভয়েই বেশ আলাপী— দুই ঘণ্টার মধ্যেই গৃহিণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া বসিয়াছেন।

আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কাজটি হ'লে খুবই ভাল হবে, অণিমাতে আর ঠাকুরপোতে বেশ মানাবে, ঠাকুরপোর ভাগ্য ভাল যে, এমন ক'নে জুটছে।"

বলিতে যাইতেছিলাম যে, তোমার বর্ণনা শুনিয়া আমারই যে লোভ হইতেছে; কিন্তু সে কথা বলিলে কি রক্ষা ছিল? কাজেই বলিলাম, "এখন মণীশ ধরা দিলে হয়?"

"বল কি তুমি, ঠাকুরপো নিশ্চয়ই মেয়ে দেখে ভুলে যাবে, বিয়ে করার আগে অনেকেই অমন সাধুপনা ক'রে থাকে—আপনার কথাই মনে ক'রে দেখ না কেন?"

কথায় নিজের জীবনের অতীতের ইতিহাস ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার একটা সংকল্প ছিল—বিয়ের সময় সে কথাটা

জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। ইহা লইয়া বাসর-ঘরেও যথেষ্ট কর্ণমর্দ্দন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কাজেই 'কাল-পেঁচার' কথায় চুপ করিয়া রহিলাম।

কথা হইল, বিকালে মণীশকে লইয়া কন্যা দেখাইতে হইবে। কিন্তু ব্যাপারটি সমস্তই গোপনে করা হইবে, মণীশ জানিতে পারিলে কি করিয়া বসে, কে জানে।

বিকালে মণীশকে বলিলাম, "চল, এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। মধুপুরে শান্তিকুঞ্জে থাকেন।" আমাদের মোটর যখন তাঁহার সুন্দর বাংলোর হাতায় প্রবেশ করিল, তখন বাংলোর সম্মুখে চারিটি মেয়ে টেনিস খেলিতেছিল। দুই জন মেম আর দুইটি বাঙ্গালী মেয়ে। তাহাদের মধ্য হইতে অণিমাকে চিনিয়া লইতে আমার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। দুধে-আল্‌তা রং—অণিমার দেহলতা হইতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছিল। যৌবনের দীপ্তি আর কুমারীর শালীনতা তাহাকে আমার নিকট মধুর করিয়া তুলিল। ক্রীড়ারতা তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মধ্যে আমি নূতন মাধুর্য্য অনুভব করিলাম। মণীশের দৃষ্টি সে দিকে ফিরাইয়া বলিলাম, "দেখছ, কি সুন্দর!"

মণীশ ক্রোধোদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "না ভাই, একে আমি সুন্দর বলতে পারি না, বাঙ্গালী মেয়ের skirt আর ফ্রক পরা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না—দেখলেই আমার মনে সেই গামছা-পরা বিবির গল্প মনে পড়ে, পরশুরামের কৃপায় সে ছবি অমর হয়ে পড়েছে—"

মণীশের কথায় আমারও একটু খটকা লাগিল। সত্যই শাড়ী-পরা বাঙ্গালীর মেয়ের ফ্রক-পরা চেহারাটা অতিশয় বিসদৃশ ঠেকে, কিন্তু আমার দৃষ্টি সজ্জার চেয়ে অণিমার রূপের দিকে ছিল।

মোটর গাড়ী-বারান্দায় লাগিতে রমণী বাবু নামিয়া আসিলেন। বলিলেন, "এস বাবা, এস।" আমি নামিয়া আমার পরিচয় দিলাম, আর মণীশের দিকে দেখাইয়া দিলাম—"এইটি আমার বন্ধু শ্রীমণীশচন্দ্র রায়।" আর মণীশকে বলিলাম, "ইনি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মিত্র।"

মণীশের মুখে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছায়া খেলিয়া গেল। সে নমস্কার করিয়া চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

রমণী বাবু গল্প আরম্ভ করিলেন। পুরাতন কাহিনী—যাহা বৃদ্ধবয়সের সম্বল, তাহাই বলিতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ যখন মানুষকে আর আশায় মাতায় না, মানুষ তখন স্মৃতির পুঁজিপাটা লইয়া কারবার চালায়। বৃদ্ধের গল্পের সূত্রে যখন বাধা পড়িতেছিল, আমি সায় দিয়া উৎসাহিত করিয়া দিতেছিলাম।

নিজের কর্ম্ম-জীবনের নানা কাহিনী শেষ করিয়া বৃদ্ধ অণিমার কথা লইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধের দুইটি পুত্র কৃতী হইয়া কাজ করিতেছে। কনিষ্ঠা কন্যা অণিমা পরম আদরের—বৃদ্ধের শেষ জীবনের নয়ন-পুত্তলী। একমাত্র মেয়ে বলিয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। তাহার পর কন্যার নানাবিধ গুণপণার ব্যাখ্যা চলিল। কবে কোন্ সাহেবের মেম কন্যাকে কি উপহার দিয়াছিল, কন্যা কবে কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল, সব বলিয়া চলিলেন।

মণীশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধের কোন কথাই যেন তাহার কাণে প্রবেশ করিতেছে না।

ইতিমধ্যে বাহিরে টেনিস খেলা শেষ হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ আমাকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার ছোট্ট মাটি এতক্ষণ খেলা করছিলেন, আপনি যদি বলেন, মায়ের একখানি গান শুমুন।"

আমার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার এখন একটু বিশেষ কাজ আছে, তুমি থাকবে ত থাক, যতীনদা, আমি চল্লুম।"

বৃদ্ধ উঠিয়া ব্যথিত ও আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "সে কি বাবা, সে কি হয়, তোমার থাকাই ত উচিত, বাবা—তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ, দেখে শুনে পছন্দ ক'রেই বিয়ে করা উচিত, কি বলেন, যতীন বাবু?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া বৃদ্ধের কথায় সম্মতি জানাইলাম। কিন্তু মণীশ লাজুক ও গোবেচারি গোছের লোক হইলেও সহসা বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আমায় ক্ষমা করবেন, আমার পিতার নিকট থেকে আপনি আমার মনোভাবের খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন, আমি বর্ত্তমানে বিয়ে করব না, আর যদি কখনও করি, আপনার মেয়েকে করবো না, কারণ, বিবিয়ানা আমার মোটেই পছন্দ হয় না, আমি আসি, আমার বন্ধুর অবিবেচনার দরুণ আমাকে এরূপ দুর্ব্যবহার করতে হ'ল। এ জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।"

মণীশ দ্রুতপদে হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি ও রমণী বাবু বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটিলে আমি রমণী বাবুকে বলিলাম, "আমায় মাপ করবেন, আমার বন্ধুর স্বাদেশিকতার কথা বোধ হয় আপনার জানা ছিল না। আসবার সময় ফ্রক্-পরা আপনার কন্যাকে দেখেই মণীশ চটে গেছে, কারণ, ও যা বলেছে, তা ঠিক, ও আজকালকার ফ্যাসনকে বরাবরই ভয়ঙ্কর অবজ্ঞা করে।"

বৃদ্ধ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "সত্য যতীন বাবু, বাবাজীর ব্যবহারে কষ্ট পেলেও আমাদেরই ভুল। আমাদের জীবনে ত কোন মতই কোন দিন গ'ড়ে উঠে নি, আমরা 'ফ্যাসনকে' মেনে চলেছি—কিন্তু কি করা যায় বলুন?"

আমি বলিলাম, "আপনি নিরাশ হবেন না, আপনার কন্যার যেরূপ গুণগ্রাম, মণীশের মন নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবে। তবে দৈবদুর্ঘটনায় প্রথম সাক্ষাৎটা হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। এ বিষয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা বিহিত, তাই করবো।"

"হাঁ বাবা, তাই করো, রমাপ্রসন্ন বাবু আমার পরিচিত বন্ধু, এ কাজটি হ'লে আমাদের সকলেরই বড় আনন্দের হবে, রাণীমাটিকে যাবার আগে আর একবার পাঠিয়ে দিও, বাবা।"

"আচ্ছা দেব, এখন আসি, অন্য সময় সস্ত্রীক এসে আপনার কন্যার সাথে আলাপ ও পরামর্শ কিছু স্থির ক'রে যাব।"

মধুপুর ছাড়িবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ফিরিয়াছিলাম।

৩

বসন্তের হাওয়া চারিদিকে মাধুর্য্যের মহোৎসব লাগাইয়াছিল। সদ্য-ফোটা আম্রমুকুলের গন্ধে সমস্ত গৃহ-ভবন সুরভিত হইতেছিল।

গৃহিণী অণিমাকে বলিলেন, "তোর দাদাবাবুকে একটা গান শুনিয়ে দে না বোন্।"

অণিমা দ্বিরুক্তি না করিয়া পিয়ানোয় বসিল। তাহার কোমল

অঙ্গুলি-সঞ্চালনে পিয়ানোর মাঝ দিয়া যেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণী বাহির হইতেছিল। অণিমা গাহিতেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই মধুর গানটি—

"আমি যদি তারে নাই বা চিনি
সে কি আমায় নেবে চিনে?
এ নব ফাল্গুনের দিনে।"

মর্ত্ত্য ভুলিয়া যেন ক্ষণিকের জন্য স্বর্গের দ্বারে পৌঁছিলাম। সেই সুধামাখা স্বর-লহরীর কি মোহময়ী শক্তি, কি অনুপম মাধুর্য্য!

সিঁড়িতে জুতার মস্‌মস্‌ ধ্বনি হইল। এ মণীশ ছাড়া আর কেহ নহে। ইঙ্গিতে অণিমা অন্য ঘরে পলাইল। গান থামিয়া গেল। মণীশের গলা শোনা গেল, "কি বৌদি! আপনি যে এমন মিষ্ট গান গাহিতে পারেন, তা কখনও জানতুম না। বা রে, গান থামিয়ে দিলেন যে।"

"না ভাই, এমন কোকিল-কণ্ঠ আমার নয়; আজ দু'দিন হ'ল আমার এক বোন্‌ এসেছে, সেই গাইছিল; মেয়েটি বড় লাজুক, তোমার পায়ের শব্দ শুনেই পালিয়েছে।"

"আমার দুর্ভাগ্য।"

আমি হাসি চাপিয়া বলিলাম, "দুর্ভাগ্য নয়, মণীশ, মেয়েটি আজ-কালকার ফ্যাসনে মানুষ হয় নি। ও আমার শালী হ'লে কি হয়, ওর মধ্যে যে শালীনতা ও ব্রীড়া দেখি, তা যেন অতীতের একটি হারানো-যুগের; ও যেন পথ ভুলে বর্ত্তমানের এই গিল্‌টিকরা জীবনের মাঝে এসে পড়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হবে না কেন, ভাই, মহাকালী পাঠশালার

পড়েছে। তার পর বাড়ীতে দু'দুটো পাশ দিয়েছে। ওর মায়ের আদেশে কলেজে যাওয়া ওর হয়েই উঠল না, এবার বিয়ে পরীক্ষা দেবে। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি যদি দয়া ক'রে ওকে কিছু পড়িয়ে দাও—"

মণীশ ভয়-ত্রস্ত হরিণের মত বলিল, "না বৌদি! তোমার কাছে আমি মাফ চাইছি, আমার সময় হবে না—"

"তা হ'লে যে আমায় মহা লজ্জায় পড়তে হবে, কাকীমাকে আমি তোমার কথা জানিয়েই যে অণিমাকে এখানে আনালুম।"

"না ভাই, মণীশ, তোমার ভয়ের কারণ নেই। তোমার গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে একে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিও, আর মধুপুরের হাঙ্গামার ভয় নাই, কারণ, এর বাপ জজ, তিনি I. C. S খুঁজছেন।"

মণীশ এবার মহা ফাপরে পড়িল। সে লজ্জিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে দাদা।"

গৃহিনী সুযোগ বুঝিয়া অণিমাকে ডাকিলেন।

আমি বলিলাম, "গুরু ও শিষ্যার পরিচয় তা হ'লে আজ হয়ে যাক্।"

সে দিন অণিমা বাসন্তীরঙ্গের একখানি মাদ্রাজী সাড়ী পরিয়াছিল। তাহাকে সত্যই 'বেহেস্তের' পরীর মত দেখাইতেছিল।

মণীশ চমকিত হইয়া অণিমার পানে চাহিয়া রহিল। অণিমা লজ্জায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই তাহাকে আরও মধুর দেখাইতেছিল।

গৃহিনী বলিলেন, "অণিমা! এই আমার মণীশ ঠাকুরপো, সারা বাঙ্গালায় এর জোড়া পণ্ডিত মেলে না। তুমি ওর কাছ থেকে যা প্রয়োজন, প'ড়ে নেবে।—"

অণিমা উত্তর করিল না, কেবল লজ্জায় ঘামিতে লাগিল।

মণীশ বলিল, "আপনার কুণ্ঠার প্রয়োজন নেই, আমার অবসরমত আপনাকে দেখিয়ে দেবো। আপনার কি পড়তে ভাল লাগে?"

অণিমা আত্মস্থ হইয়া উত্তর দিল, "আমি সংস্কৃত খুব ভালবাসি। আমাদের দেশের সংস্কৃত ও সভ্যতার সর্বোচ্চ মহিমা সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা আছে। আমার মনে হয়, সব ভুলে একবার ভারতবর্ষের সেই পুরাতন সৌন্দর্য্যের ও অনাড়ম্বর সরলতার মধ্যে যদি ফিরে যাওয়া যায়, তবেই ভারতবর্ষের রক্ষা—"

এ সব মণীশের কথার ও আদর্শের পুনরুক্তি। অণিমাকে এ সব শিখাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। আমার প্রদত্ত শিক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দর হইয়াছে দেখিয়া বেশ আনন্দ লাগিতেছিল।

মণীশ অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। তাহার পর ভাব-গদ্‌-গদ্‌-কণ্ঠে বলিল, "আপনার কথা শুনে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। আজ আমাদের দেশে মানুষরা লুব্ধ বৈরাগ্যে য়ুরোপের দ্বারে কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় কি আর হ'তে পারে! আপনার কাছে আজ নূতন ভারত-নারীর যোগ্য কথা শুনে যে কি পুলকিত হয়েছি, তা আর বলবার নয়—"

মণীশের এ কথায় অবিশ্বাস্য কিছুই ছিল না। প্রত্যেক মানুষ চাহে, আপনার মত সকলের মনে জাগ্রত ও প্রস্ফুট হউক।

অণিমা সাবলীলভাবে উত্তর দিল, "না, আপনি আমায় বড় ক'রে তুলছেন, আমি যা বলছি, ভারতবর্ষে আজ এই কথা বলার দরকার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের নারী ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করবে—"

মণীশের পুলকের সীমা রহিল না। টেবল চাপড়াইয়া সে সহর্ষে

বলিল, "যে দিন প্রতি পরিবারে আপনার মত নারীর উদ্ভব হবে, সে দিনই আমাদের মুক্তি।"

গৃহিণী এই সব কথায় বিশেষ সুখানুভব করিতেছিলেন না। তিনি কথার মোড় ফিরাইয়া বলিলেন, "কাল থেকে তোমরা এ সব বক্তৃতা করো, আজ বরং গুরুদক্ষিণা বাবদ অণিমা তোমায় একটা গান শুনিয়ে দিক্।"

আমি বলিলাম, "তথাস্তু, অমৃতে কার অরুচি?"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে অণিমা, তুই দু' একটা গান গা। আমি ঠাকুরপোকে বরং একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দেই।"

"না, তার এখন প্রয়োজন নেই, বৌদি।"

"না ঠাকুরপো! এ না খেলে চলবে না, এ তোমার ছাত্রীর নিজে হাতের তৈরী করা আম-সন্দেশ।"

অণিমা বলিল, "না বৌদি! ওঁকে ও সব ছাই-ভস্ম দিও না, উনি কি তা' খেতে পারবেন?"

আমি বলিলাম, "ছাই-ভস্মে আমার কোনই আপত্তি নেই জেন, লক্ষ্মীটি।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বা, তুমি যে বিকালে খেয়েছ?"

"তা অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে। আমার 'পরে তোমার এত প্রসন্ন দৃষ্টি ভাল নয়, গিন্নি!"

অণিমা ও মণীশ হাসিয়া উঠিল। লজ্জিতা উনি খাবার আনিতে চলিলেন। তাহার পর গান চলিল। মণীশ কাজকর্ম্ম ভুলিয়া বহুক্ষণ সেই মধুর গান শুনিল, তার পর বিদায় লইল।

বিদায় লওয়ার সময় মনে হইল, মণীশ যেন একটি নূতন আলোক লাভ করিয়াছে, তাহার অজস্র আনন্দ যেন সে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিল না।

৪

যে ফাঁদ পাতা হইয়াছিল, তাহাতে মণীশ ধরা পড়িল। মণীশের বৈরাগ্য কোন বিশেষ যুক্তি বা মতবাদে গড়া ছিল না, কাজেই অণিমার মত মেয়ের সাহচর্য্যে তাহার ব্রতের কথা সে ভুলিয়াই বসিল।

অণিমা মণীশের আদর্শ ও যুক্তির টোপ দিয়া প্রথমে মণীশকে ভুলাইয়াছিল সত্য, কিন্তু অভিনয়ের বাহিরেও অণিমার শিক্ষা ও দীক্ষা অবহেলার বিষয় ছিল না। যৌবনের যে সময়ে মানুষের মন নারীর সঙ্গ কামনা করে, সেই সময়ে মণীশ অণিমার সাহচর্য্যে আপনার বিরূপ দাম্ভিকতার পরিচয় পাইল ও দিনে দিনে প্রণয়ের টোপ গিলিতে লাগিল।

কিন্তু গৃহিণী বলিলেন, মাছকে না খেলাইয়া কিছুতেই ডাঙ্গায় তুলিবেন না। কাজেই সচিবের কথায় আমারও মন টলিল। সে দিন সন্ধ্যার মজলিসে মণীশকে বলিলাম,"অণিমা ত কাল যাবে, ভাই!"

মণীশ চমকিত হইয়া বলিল, "কাল?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ওর বাপ চিঠি লিখেছেন, মিঃ সেন ব'লে এক জন I. C. S. পুরুলিয়া বেড়াতে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে অণিমার আলাপ-পরিচয় করানো প্রয়োজন, সেই জন্য কালই ওকে যেতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু দেখো, ঠাকুরপো, ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা, অণিমা

চায় চিরকুমারী থেকে ভারতবর্ষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে, কিন্তু তা না হয়ে কোথায় ওকে কোন্ বিলাতী নকল সাহেবের কাছে সাহেবিয়ানা শেখা নিয়ে জীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে তুলতে হবে।"

মণীশ আর্দ্রস্বরে বলিল, "কিন্তু অণিমা ত সাবালিকা, উনি ইচ্ছা করলে—"

অণিমা বলিল, "আমার সাধ আমার পিতার অজ্ঞাত নয়; কিন্তু পিতা যদি বলেন, আমাকে তাঁর আশা পূর্ণ করতেই হবে, কারণ, ভারতবর্ষের নারী স্বার্থকে কখনও বড় ক'রে দেখে নি, ধর্ম্মকে সে চির-মহীয়ান্ ক'রে তুলেছে, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

সেই পিতার আদেশে আমি সব জলাঞ্জলি দিতে পারি। আপনার কাছেও ত আমি প্রাচ্য আদর্শের এই মহাবাণী লাভ করেছি।"

মণীশের মুখ চুণ হইয়া গেল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "সত্যই অণিমা, তুমি শুধু আমার ছাত্রী নও, আমার গুরু। পিতার আদেশকে নির্ব্বিচারে পালন করাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। রামায়ণের যশঃসৌরভ এই মহান্ পিতৃভক্তির উৎসে সঞ্জাত।"

অণিমা লজ্জাবিনম্র কণ্ঠে উত্তর দিল, "আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না; আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার শিক্ষা ও আদর্শের আলো যেন আমার চোখে কখনও নিষ্প্রভ না হয়।"

মণীশ কিছুক্ষণ কথা কহিল না। পরে বলিল, "অণিমা, দম্ভ মানুষকে

অন্ধ ক'রে দেয়, মোহ পথ-ভ্রান্ত ক'রে তুলে, তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার ক্ষমতা আমার নাই, আমি কায়মনে প্রার্থনা করছি, তুমি ভারতীয় নারীর প্রতীক হয়ে ভারতবর্ষের গৌরব বাড়িয়ে তুলতে পারবে।"

গৃহিণী ও আমার দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। তাহার কালো দুইটি ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসির বিজলী খেলিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অণিমা চলিয়া যাওয়ায় মনটা বিরস হইয়া গিয়াছিল। মণীশ সন্ধ্যার সময় আসিল, তাহার বিবন্ন মুখ দেখিয়া সত্যই আমার কৃপা হইতেছিল। কিন্তু গৃহিণীর অমতে কোন বিষয় ফাঁস করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীশ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দাদা, বাবাকে লিখে দাও, আমি বিয়ে করতে রাজী, তাঁর যেখানে আদেশ হবে, সেইখানেই আমি বিয়ে করবো।"

গৃহিণী হাস্যক্রুর কণ্ঠে বলিলেন, "না, ঠাকুরপো, অমন কাজটি করো না, ফ্রক-পরা বউ ঘরে আনলে শেষে তোমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

মণীশ এই শ্লেষের উত্তর দিল না, শুধু আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "না বৌদি, মুখে এক বলা আর কাজে অন্যরূপ করা আমার চলবে না, অণিমা সত্যই আমায় শিক্ষা দিয়েছে।"

গৃহিণী তবু সুর নামাইলেন না। বঁড়শীতে মাছ খেলাইতে শিকারীর যথেষ্ট আনন্দ আছে, কিন্তু সে নিষ্ঠুর আনন্দ মাছকে নিশ্চয়ই বিশেষ পীড়া দেয়।

গৃহিণী বলিলেন, "মধুপুরের ক'নে আনলে তোমার মনে ভয়ানক অশান্তি হবে, ঠাকুরপো। তোমার পিতা ত তোমায় যে আদেশ করেন নি।"

"আদেশ না করুন, পিতার এইটি মনোগত ইচ্ছা, আমি তা পালন করবো।"

"তার চেয়ে বরং অণিমার সঙ্গে তোমার মনের মিল হ'তে পারে। তুমি যদি বল ঠাকুরপো, তা হ'লে আমাকে বরং ঘটকালির ভার দাও, আমি কাকাবাবুকে বুঝিয়ে পড়িয়ে—"

"না বৌদি, তার প্রয়োজন নেই, আমাদের অলক্ষ্যে এক জন মানুষের ভাগ্য গ'ড়ে তুলছেন, আমি তাঁর হাতেই আত্মসমর্পণ করবো।"

মণীশের এই আত্মসমর্পণের ভাব আমায় পীড়া দিতেছিল। মনে হইতেছিল, বেচারীকে সব বলিয়া তাহার মনকে শান্ত করি।

"তা হ'লে শেষে পস্তালে কিন্তু আমাদের দোষ নেই, ঠাকুরপো। টেনিস-খেলা ও ফ্রক-পরা বউ নিয়ে তোমার যে কি দুর্দ্দশা হবে, তা আর বলবার নয়।"

"হ'ক, সমস্ত দুঃখকে আমি হাসিমুখে বরণ করবো।"

কতক্ষণ আর কথা চলিল না। হাস্য-পরিহাস এ দিন যেন আর জমিতে চাহিতেছিল না।

আমি বলিলাম, "বেশ মণীশ, তুমি যখন সুবুদ্ধি ফিরে পেয়েছ, ভালই। আমি কালই তোমার বাবাকে চিঠি লিখছি। ফাল্গুনের শেষ জ্যোৎস্না আর বিফল হবে না, যাক্, All's well that ends well সব ভাল যার শেষ ভালো, তোমার পিতা নিশ্চিতই খুশী হবেন, কিন্তু—"

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না দাদা, বেশী আশাতুর হয়ে থেকো না, ভগবান্ মানুষের দম্ভকে যে কতরূপে ভাঙ্গেন, তা মানুষ বুঝতে পারে না।"

৫

তার পর ফাল্গুনের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে শুভ মিলনোৎসব সম্পন্ন হইল। গৃহিণী রমণী বাবুর গৃহে যাইয়া কর্ত্রীরূপে অবস্থান করিলেন। সফল দৌত্যের জন্য তাঁহার সমাদর সেখানে যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর রমণী বাবু গৃহিণীকে এমনই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহের আনন্দোৎসবে রাণীকে একটি সুন্দর মণি-খচিত পুষ্পহার দিয়াছেন, কাজেই আমাদেরও আনন্দের সীমা ছিল না। গহনা-লোভী প্রিয়ার গঞ্জনা কতিপয় মাস শোনা যাইবে না ভাবিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতেছিলাম।

এ দিকে রমাপ্রসন্ন বাবু সপরিবারে রাঁচি পৌঁছিলেন। আনন্দ-কোলাহলে বাড়ী মুখর হইয়া পড়িয়াছে। মণীশের পক্ষে যে অপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দ সঞ্চিত আছে, তাহা ভাবিয়া মহা কৌতুক অনুভব করিতেছিলাম।

ফ্রক-পরা বধূর গল্প বন্ধুমহলে রটিয়া গিয়াছিল। সবাই মিলিয়া মণীশকে ত্রস্তবিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সুরেশ হাসিয়া বলিল, "না ভাই, তোরা আর বিরক্ত করিস না, পিতৃভক্তির এমন অনুপম দৃষ্টান্ত কলিযুগে বিরল। বাল্মীকি আজ নাই, তা হ'লে নূতন রামায়ণ রচনা হ'ত।"

রমেশ সরবতের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "কিন্তু এ ভাই মহা মুস্কিল হ'ল, মণীশ-দা যখন মনুর বিধান খুলে বৌদিকে বলবেন, পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং, বৌদি তখন টেনিস-র‍্যাকেট হাতে ক'রে বলবেন—যুদ্ধং দেহি।"

হাসিমুখে হরিশ উত্তর দিল—"কথায় বলে দাদা, ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্। কোথায় বেপথুমতী কিশোরী আসবে,—রসালের গায়ে যেমন মাধবীলতা, কিন্তু এ যেন বাজ-পাখিনীর সাথে কোকিলের মিলন।"

মণীশ হাসিয়া উত্তর দিল, "তোদের দুঃখ করবার প্রয়োজন নেই ভাই—হরিশ! তোর কালিদাসের উপমাগুলি বাঙ্গালা দেশের পাঠকরা বুঝতে পারে না, এই যা দুঃখ, নইলে যদু-মধুর লেখা বিকিয়ে গেল, অথচ তোর বই পোকায় কাটছে!"

আমি বলিলাম, "ভাই মণীশ, আজ আনন্দের দিনে এরূপ নিষ্ঠুর আলাপ করা উচিত নয়।"

"আমি ক্ষমা চাইছি, হরিশদা, তুই ভাই কিছু মনে করিস না, সংসারে বৈচিত্র্য ও বিরোধের প্রয়োজন, দুর্দ্দমকে জয় করেই বীরের আনন্দ, অপ্রাপ্যকে পাওয়ার জন্যই যৌবনের জয়-যাত্রা—"

সুরেশ বলিল, "না মণীশ, তোর আশাকে অত বিপুল ক'রে তুলিস্ না, শেষে না পস্তাস।"

মণীশ বলিল, "সে ভয় নেই, সুরেশ, দেখিস্, বিলাতীর মোহ যাকে পেয়ে বসেছে, তাকেই আমি ভাবী ভারতের জয়লক্ষ্মী ক'রে তুলবো।"

ভোজনের ডাক আসিল, কাজেই এখানে এ তর্ক-বিতর্কের শেষ হইল। দুইটি হৃদয়ে মিলন যখন হয়, তখন যেন নূতন করিয়া মনের মাঝে শানাই যৌবনের হাওয়া জাগাইয়া তোলে। তাই পরিণয়ের নূতনত্ব কোন দিন যেন শেষ হয় না—প্রতি পরিণয়ের মধ্যেই যেন একটা নূতন স্বাদ, নূতন মাধুরী জড়ানো থাকে।

অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বিবাহের আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চারিদিকে তখনও ভাঙ্গা-হাটের কোলাহল লাগিয়া রহিয়াছে। রাত্রির মত বিদায় লইবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম।

একটি সুসজ্জিত কক্ষে মণীশ, নব-পরিণীতা বধূ, গৃহিণী ও অন্যান্য

কতিপয় মহিলা বসিয়াছিলেন। প্রবেশ করিয়া স্মিতহাস্যে বলিলাম, "কি ভাই, বিবির সাথে আলাপ হ'ল ত, এখন আমরা গয়ার পাপ বিদায় হই।"

মণীশ কৌতুকোচ্ছল স্বরে বলিল, "যতীনদা, বিবির সাথে আমার কোন দিন আলাপ হয় নি আর হবে না, আমি যেমন সাদাসিদে লোক, আমার বধূও তেমনি হয়েছে, সে জন্য তোমার কোনও চিন্তা নেই।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! কেমন জব্দ! বড় যে বড়াই করেছিলে, এ মেয়েকে কখনও বিয়ে করবে না—কেমন, হয়েছে এখন?"

মণীশ অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "যাকে বিয়ে করবো না বলেছি, তাকে ত বিয়ে করি নি, এ ত তোমার ফ্রক-পরা মিস্ মিটার নয়, এ যে আমার মনের হারানো আদর্শ, আমার যাত্রাপথের জয়শ্রী—এ যে অণিমা!—"

"তার জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কি বল?"

মণীশ বলিল, "কৃতজ্ঞতা রয়েছে বৈ কি, কিন্তু তুমি যে ভেবেছিলে, আমার মহা আশ্চর্য্য ক'রে দেবে, তা পার নি দাদা, আগেই আমি অণিমার সন্ধান পেয়েছিলাম।"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ হইয়া গেল। মণীশ চুপে চুপে পাত্রীর পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিল, কাজেই বিবাহে তাহার অমত হয় নাই। নিজের বুদ্ধির বড়াই খুব করিতাম, ঠকিয়া আজ শিখিলাম যে, মানুষের চাতুরী সর্ব্বত্র সফল হয় না। বলিলাম, "তা হ'লে তোমারও অভিনয়-দক্ষতা আছে দেখছি?"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "দুঃখিত হয়ো না, দাদা! এতে তোমাদের কোনও হাত নেই। অণিমা ভুলে আমার কাছে একটি বই ফেলে আসে, তাতে শ্বশুর মহাশয়ের ঠিকানা লেখা ছিল, কাযেই আমার পক্ষে সন্ধান পাওয়া কঠিন হয় নি।"

আমি বলিলাম, "না ভাই, তোমার মনের কষ্ট অনেক আগে ঘুচেছে, এতে সুখ বৈ দুঃখ নেই। কিন্তু অণিমা, তুমি যে আমার সাধের কল্পনাটি ভরা বাজারে ডুবিয়ে দিলে, এ আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না, যদি না সপ্তাহে সপ্তাহে তুমি তোমার মিঠা হাতের সন্দেস খাওয়াও।"

অণিমা উত্তর দিল না, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "হয়েছে পেটুক মহারাজ! এখন পালাও, রাত হয়েছে, ওদের এখন ঘুমাতে দাও।"

"বা! তা হ'লে দেখছি, আমার ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ—মণীশ কলা দেখিয়েছে, আর অণিমা, তুমিও নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ালে?"

বীণা নিন্দিত স্বরে অণিমা বলিল, "আপনার বন্ধুর সাথে বোঝা-পড়া আপনারাই করবেন, দাদাবাবু! কিন্তু রেঁধে আপনাকে খাওয়ানোর সুখ থেকে যেন কোন দিনই বঞ্চিত না করেন।"

সহর্ষে উত্তর দিলাম, "জয়োঽস্তু কল্যাণি! সে বিষয়ে অন্যথা হবে না, আশীর্ব্বাদ করি, চির পতি-সোহাগিনী হও।"

বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে তখন ফাল্গুনী জ্যোৎস্না বিশ্বকে পরিপ্লুত করিয়া রাখিয়াছিল।

সমাপ্ত